জ্যোতিরিঙ্গণ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ

চৈত্র, ১৩৫৫

মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
ও পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীনন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

পণ্ডিতবর শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে

এই লেখকের

পথের পাঁচালী

অপরাজিত

অনুবর্ত্তন

দেবযান

উপলখণ্ড

নবাগত

উৎকর্ণ

ক্ষণভঙ্গুর

অসাধারণ

ঊর্মিমুখর

তৃণাঙ্কুর

হে অরণ্য কথা কও

আরণ্যক

মৌরীফুল

যাত্রাবদল

অভিযাত্রিক

কেদার রাজা

বিপিনের সংসার

আদর্শ হিন্দু হোটেল

আচার্য্য কৃপালনী কালোনী

মুখোশ ও মুখশ্রী

জন্ম ও মৃত্যু

কিন্নর দল

ইত্যাদি —

সংসার

উপেন ভট্টচাজেব পুত্রবধূ বেশ সুন্দবী। একটি মাত্র ছোট ছেলে নিয়ে অত বড পুবনো সেকেলে ভাঙা বাড়িব মধ্যে একাই থাকে। স্বামীর পরিচয়ে বৌটি এ গ্রামে পবিচিতা নয়, অমুকের পুত্রবধু এই তার একমাত্র পরিচষ। কাবণ এই যে, স্বামী ভবতারণ ভট্টচাজ ভবঘুরে লোক। গাঁজা খেয়ে মদ খেয়ে বাপের যথাসর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিয়েচে, এখন কোথায় যেন সামান্য মাইনেতে চাকরী করে, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসে, কোনো শনিবারে আসেই না। শ্বশুর উপেন ভট্টচাজ গ্রামের জমিদার মজুমদাবদেব ঠাকুরবাড়িতে নিত্যপূজা করেন। সেখানেই থাকেন, সেখানেই খান। বড় একটা বাড়ি আসেন না তিনিও। ভাল খেতে পান বলে ঠাকুরবাড়িতেই পড়ে থাকেন, নইলে সকালেব বাল্যভোগের লুচি ও হালুয়া, বৈকালীর পায়েস, দই ও ফলমূল বারোভূতে লুটে খায়।

কোনো কোনো দিন সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়ি আসেন। হাতে একটা ছোট্ট পুঁটুলি, তাতে প্রসাদী লুচি ও মিষ্টি, ফলমূল, একটু বা ক্ষীরের ছাঁচ থাকে। তাঁর নাতি করুণার বয়স এই সাত বছর। না খেতে পেয়ে সে সর্ব্বদা খাই খাই করচে, যা হয় পেলেই খুশি, তা কাঁচা আমড়া হোক্, পাকা নোনা হোক্, চাল ভাজা হোক্, তালের কল্ হোক,

আধপাকা শক্ত যেন হোক। খাওয়া পেলেই হোল, স্বাদের অনুভূতি তার নেই। ঝাল, টক্, মিষ্টি, তেতো তার কাছে সব সমান।

—ও করুণা, এই ত্থাখ্—কি এনিচি—

—কি ঠাকুরদাদা ?

'দাদু' 'টাদু' বলার নিয়ম নেই এসব অজ পাড়াগাঁয়ে, ওসব সৌখীন শহুরে বুলি করুণা শেখে নি। সে ছুটে যায় উৎসুক লোভীর ব্যগ্রতা নিয়ে। ঠাকুরদাদা পুঁটুলি খুলে দুখানা আখের টিক্লি, একটা বাতাসা ওর হাতে দেন। ও তাতেই মহাখুশি। ঠাকুরদাদা যে জিনিস দেন, তার চেয়ে যে জিনিষ দেন না তা অনেক ভালো ও অনেক বেশি। পুঁটুলির সে অংশে থাকে বৈকালী ভোগের লুচি, কচুরী, মালপুয়া ও তালের বড়া। যখনকার সময়ের যে ফল সেটা ঠাকুরকে নিবেদন করার প্রথা এ ঠাকুরবাড়িতে বহুকাল থেকে প্রচলিত। এখন ভাদ্র মাস, কাজেই তালের বড়া রোজ বিকেলে নিবেদিত হয়।

করুণা এক আধ বার পুঁটুলির অন্য অংশে চাইলে।

কিন্তু তাতে তার লোভ হয় না, ও রকম দেখতে খুব ছেলেবেলা থেকে সে অভ্যস্ত। সে জানে ও অংশে ওর কোনো অধিকার নেই।

ঠাকুরদাদার দিকে ও বোকার মত চেয়ে থাকে। উপেন ভট্চাজ গলায় কাসির আওয়াজ করে পুত্রবধূকে তাঁর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করতে করতে বাড়ি ঢোকেন এবং সটান দোতলায় নিজের ঘরটিতে চলে যান।

রোজ তাঁর ঘরটিতে নিজে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যান এবং এসে আবার খোলেন। পুত্রবধূকে বিশ্বাস করার পাত্র নন তিনি। কোনো মেয়ে মানুষকেই বিশ্বাস নেই।

—ও বৌমা—বৌমা, ওপরে এসো—

জ্যোতিরিঙ্গণ

—কে? বাবা?

—একবার ওপরে এসো—

পুত্রবধূ ওপরে গিয়ে দেখে শ্বশুর পুঁটুলি খুলে কি সব খাবার জিনিস ত্রস্ত ভাবে হাঁড়ির মধ্যে পুরচেন। পুত্রবধূকে দেখে তাড়াতাড়ি তিনি হাঁড়িটার দিকে পেছন ফিরে বসে বল্লেন—বৌমা? ইয়ে করতো—আমার ঘরে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে যাও—

—আপনি রাতে কি খাবেন? ভাত রাঁধবো?

—না। তুমি শুধু খাবার জল একঘটি দিয়ে যেও এরপরে।

এ সংসারে বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যে পুত্রবধূর রাঁধবার নিয়ম নেই। যার যার, তার তার। ছেলে যখন আসে, বাপের খোঁজ নেয় না। ওরা নিজে রাঁধে, নিজেরা খায়। উপেন ভট্‌চাজ এসে নিজের ঘরের তালা খুলে বড় জোর একটু জল, কোনোদিন একটু নুন চান পুত্রবধূর কাছে। এর বেশি তাঁর কিছু চাইবার থাকে না, কেউ তাঁকে দেয়ও না। আজ পুত্রবধূর তাঁর জন্যে রান্না করার প্রস্তাবে তিনি খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারেন নি মনে মনে। বোধ হয় সেজন্যেই পুত্রবধূর প্রতি তাঁর মনোভাব হঠাৎ বড় দরাজ হয়ে গেল। তার ফলে যখন আবার সে জলের ঘটি নিয়ে ঢুকলো, তখন তিনি হাঁড়িটা সামনে নিয়ে বল্লেন—দাঁড়াও বৌমা। করুণাকে দিইচি—আর তুমি এই দুখানা লুচি আর এই একটু মিষ্টি নিয়ে যাও। জল খেও।

পুত্রবধূ দুই হাত পেতে শ্বশুরের দেওয়া আধখানা ক্ষীরের ছাঁচ, খানচারেক লুচি, অর্ধখানা ছানার মালপুয়া ও দুটি তালের বড়া নিয়ে একটু অবাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

শ্বশুর হঠাৎ কেন এত সদয় হয়ে উঠলেন তার ওপরে। না খেয়ে থাকলেও কখনো পোছেন না, সে খাচ্চে না উপোস করচে।

সে বল্লে—আমি যাই বাবা ?

—হ্যাঁ যাও। পান আছে ?

—না তো বাবা। এ হাটে আমার হাতে পয়সা ছিল না। করুণার পাঠশালার মাইনে চার আনা বাকি। তাগাদা করচে মাষ্টার। তাও দিতে পারচিনে।

পুত্রবধুর নাম তারা। গরীব-ঘরের মেয়ে না হোলে আর এমন সংসারে বিয়ে হবে কেন! নিচে নেমে এসে সে ছেলেকে ডেকে দুখানা লুচি আর মিষ্টিগুলো সব খেতে দিলে। নিজের জন্যে রাখলে দুখানা লুচি আর দুটো তালের বড়া। ছেলেকে তালের বড়া খেতে দিলে ওর পেট কামড়াবে রাতে।

সত্যি, তার হাতে পয়সা না থাকায় কোনোদিনই রাত্রে সে কিছু খায় না। করুণার জন্যে দুবেলার চাল নেওয়া হয় ওবেলা, জল দেওয়া ভাত সন্ধ্যের পিদিম জ্বালিয়েই করুণাকে খেতে দেয়। তারপর মায়ে পোয়ে শুয়ে পড়ে।

নিত্য নক্ষত্র ওঠে আকাশে, নিত্য চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে যায় ওদের মস্ত বড় ছাদটা। ও ছেলেকে নিয়ে অত বড় বাড়ির মধ্যে একখানা ঘরে শুয়ে থাকে, ইঁদুর খুট্‌খাট্‌ করে, কলাবাদুড় পুরনো বাড়িব কোণে কোণে চটাপট্‌ শব্দে ওড়ে, ছাদের ধারের বেল গাছটাতে বেলের ডাল বাতাসে দোলে—কোনো কোনো দিন ওর ছেলের ঘুম ভেঙে যায়, ভয়ে মাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে— ও কি ঘুট্‌ঘুট্‌ করচে মা ?

—কিছু না তুই ঘুমো। ও ইঁদুর—

—বাইরে ছাদে। ওই শোনো—

—ও কিছু না। তুই ঘুমো—

—শাঁকচুন্নি আছে মা বেলগাছে ?

—না। সে সব কিছু না।

—শোনো মা, রেতার দাদা গপ্প করছিল, তাদের বাঁশঝাড়ে শাঁকচুন্নি আছে—রেতা নিজেও দেখেচে একদিন, বুঝলে মা ?

—তুই ঘুমো। ওসব বাজে গপ্প। আচ্ছা, খোকন, আমি একা একা রাত আটটার সময় পুকুরে কাপড় কেচে আসি। আমি কিছু তো দেখিনে।

উপেন ভট্‌চাজের পুত্রবধুর সাহস খুব, একথা গাঁয়েও সকলে বলাবলি করে। অত বড় প্রাচীন অট্টালিকায় বহু ঘরদোরের মধ্যে ছোট্ট একটা ছেলে সম্বল করে বাস করে—ওই ভূতের বাড়িতে বাবা! শ্বশুর তো কালেভদ্রে বাড়ি ফেবে, সোয়ামীও প্রায় তাই। শনিবারে যদি বা এল, রবিবার বিকেলেই চলে গেল। ধন্যি সাহস বটে মেয়েছেলের!

কেউ কেউ বলে—মেয়ে মানুষের ভাই যাই বলো, অতটা সাহস ভালো না। স্বভাব চরিত্তির কার কি রকম তা তো কেউ বলতে পারে না।

শেষ রাত্রে করুণা আবার মাকে ঠেলা মেরে বল্লে—ওমা, ওঠো না ? কিসের শব্দ হচ্চে—

—তুই বাবা আর ঘুমুতে দিলি নে। কই কোথায় শব্দ ?

কে এসে দরজায় ঘা দিলে। কড়া নাড়লে ওদের ঘরের বাইরে।

তারা ধড়মড় করে উঠে বল্লে—কে ?

বাইরে থেকে উত্তর এল—আমি। দোর খোলো।

করুণা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো প্রায়।

—ও বাবা—

তারা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে খিল খুলে দিয়ে একগাল হেসে বল্লে—এসো এসো। একেবারে শেষ রাত্তিরে? ভালো আছো?

—হ্যাঁ। বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আস্তি যা কষ্ট হয়েছে। তালপুকুরের মাঠের মধ্যে বাস খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাত দশটা থেকে। এই খানিকটা আগে তখন চললো।

—তুমি হাত মুখ ধোও। জল গামলায় আছে, গাড়ুতে আছে। আমি ভাত চড়াই।

—ভাত? শেষ রাত্তিরি ভাত খেয়ে মবি আর কি। আমাব পুঁটুলির মধ্যে সরু চিঁড়ে আছে, তাই দুটো ভিজিয়ে দ্যাও। খোকা সরে আয়, তোর জন্যি জিলিপি কিনেছিলাম, তা মিইয়ে ন্যাতা হয়ে গিয়েছে। এই ন্যাও, খোকারে দুখানা দ্যাও, তুমি দুখানা খাও।

—আমি খাবো না, তুমি খেয়ে এট্টু জল খাও।

—ওগো না না। যা বলচি শোনো না। আমাব পেট ভাল না ক'দিন থেকে। সরু চিঁড়ে ভিজিয়ে লেবুর রস আর নুন মেখে বেশ কচ্‌লে কচ্‌লে কথ্ বের করে—

—থাক, থাক। তোমাকে আর শেখাতে হবে না। হাত মুখ ধুয়ে এসো।

—যাবো। তার আগে একবার গাড়ুটা দাও দিকি?—গামছাখানা এখানে রেখে দিও। আসচি আমি।

তারা তখুনি চিঁড়ে ভেজাতে দিলে। স্বামী এসে হাত মুখ ধুয়ে বসলো, তার সামনে পাথরের একটা বড় বাটিতে চিঁড়েব কথ্ নুন নেবু মিশিয়ে তাকে খেতে দিলে। স্বামী একটুকু মুখে দিয়েই বল্লে—বাঃ, বেশ! নুন নেবু মিশিয়ে বড় চমৎকার খেতে লাগচে!

—আর দেবো ?

—না না এই বেশি হয়েচে। হ্যাঁগা, ধার দেনা কত এবার ?

—মাছ নিইছিলাম একদিন চার আনা, একদিন দু আনা। আর খোকা আমসত্ব খেতে চেইছিল, তাই বোষ্টম বাড়ি থেকে কিনে এনেছিলাম দু আনার।

—আমসত্ব আবার কিনতে গেলে ? বড় নবাব হয়েচ না ?

স্বামীর মুখে কড়া সুরের কথা এই প্রথম নয় তারার। ওর চেয়ে অনেক বেশি রূঢ় ব্যবহার ও কথা সে সহ্য করে আসচে স্বামীর।

গা সওয়া হয়ে গিয়েচে তার।

তাও বিনি দোষে। খোকা খেতে চেয়েছিল, ছেলেমানুষ আব্দার ধরলে, ও কি বোঝে কিছু ? অবোধ। না দিতে পারলে কষ্ট হয়।

—বারে, খোকা কাঁদতে লাগলো, দেবো না কিনে ?

—না। বাপের বাড়ি থেকে পয়সা এনে দিও—

—মুখ সামলে কথা কও বলছি। বাপ তুলো না খবরদার—

—ওরে বাপ্‌রে! দেখো ভয়েতে ইঁদুরের গর্ত্তে না ঢুকি। তবুও যদি বাপের বাড়ির চালে খড় থাকতো !

—ছিল না বলেই তো তোমার মত অজ্‌ পাঁড় মুক্‌খু আর মাতালের হাতে বাপ দিইছিল ধরে—

—তবে রে—

স্বামী ভবতারণ হাতের কাছে ছাতা পেয়ে তাই উঁচিয়ে গেল তারার দিকে। করুণা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো ভয়ে, ওপর থেকে উপেন ভট্‌চাজ বলে উঠলেন—কে ? কে ? কি হোল ? কে ওখানে ?

ভবতারণ উদ্যত ছাতা নামিয়ে বল্লে—তোমায় আমি—ফের যদি—ছোটলোকের মেয়ে কোথাকার !

—খবরদার! আবার বাপ তুলচো? বেরোও তুমি বাড়ি থেকে। দূর হও। তোমার মুখে ছাইয়ের নুড়ো দেবো বলে দিচ্চি। বেরোও—

—হারামজাদী, হ্যাখ্। এখনো মুখ সাম্‌লা বলে দিচ্চি। বেরোবো কেন, তোর কোন বাবা এ বাড়ি করে রেখে গিইছিল জিগ্যেস করি? তুই বেরো—

করুণা আকুল সুরে কাঁদচে বাবা মার ধুন্দুমার ঝগড়ার মাঝখানে পড়ে গিয়ে। ওর মা এসে ওকে কোলে নিয়ে বল্লে—চল্ খোকা আমরা এ বাড়ি থেকে চলে যাই—ওরা থাকুক, যাদের বাড়ি। তোর আমার বাড়ি তো না!

—খবরদার, খোকাকে ছুঁয়ো না বলচি। যাবি হারামজাদী তো একলা মরগে যা—খোকা তোর না আমার?

—বেশ। রাখো খোকাকে। আমি একলাই যাচ্চি—

—যা—বেরো—

করুণা ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—মা, তুমি যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাবো—

ভবতারণ বল্লে—খোকন, কেঁদো না। তোমায় আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো। রেলগাড়ী কিনে দেবো। মটোর কিনে দেবে—এসো—

করুণা কান্নায় জড়িত সুরে বল্লে—না—

—এসো—

—না—

—কলকাতায় যাবি নে?

—না—

মাকে সে আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরে।

এমন সময়ে ওপর থেকে উপেন ভট্‌চাজ নেমে এসে ছেলেকে

বল্লেন—তুই কি চেঁচামেচি আরম্ভ করলি ভোর রাত্তিরি? তুই মানুষ হলি নে এই দুঃখে যার আমি বাড়ি আসি নে। কেন মিছিমিছি বৌমাকে যা তা বল্‌ছিস? আমি সব শুনচি নে ওপর থেকে? তোরই তো দোষ। ও আমার ঘরের লক্ষ্মী—

আপনাকে তো কিছু বলিনি—আপনি ওপরে যান বাবা—আমাদের কথার মধ্যে আসতে কে বলেছে আপনাকে?

—আমি যাই না যাই সে আমি বুঝবো। আর তুই যে বলচিস্ বৌমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে—আমার বাড়ি না তোর বাড়ি? আমি আজো বেঁচে নেই? তোর কি দাবি আছে এ বাড়ির ওপর? আমি ওপর থেকে সব শুনেচি। বদমাইস পাজি কোথাকার। আমি মরবার আগে খোকনকে বাড়ি লিখে দিয়ে যাবো—কালই যাচ্চি আমি সদরে। বৌমাকে অছি করে যাবো। তোমার বাড়ির আস্বা ঘুচিয়ে তবে আমার কাজ, হতচ্ছাড়া বদ্‌মাইস। রাত দুপুরের সময় এসে উনি ঘরের বৌকে বলবেন, বেরো, বেরো। মুরোদ নেই এক কড়ার—হ্যাঁরে হারামজাদা, ও ভদ্দরনোকের মেয়ে সারা মাস কি খায় তুই তার কোনো হদিস রাখিস? না কেউ রাখে? বেরো বলতি লজ্জা করে না? এসো তো খোকন, এসো—চলো বৌমা—ওপরের ঘরে চলো—

তারা ঘোম্‌টা টেনে দিয়েছিল শ্বশুর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই। সে ফিস্ ফিস্ করে খোকনকে কি বল্লে।

খোকন বল্লে—ঠাকুরদাদা, তুমি ওপরে যাও—মা বলছে—

ভবতারণ সাহস পেয়ে বল্লে—আমি তাড়িয়ে দেবার কথা আগে মুখে এনিচি না আপনারি গুণধর বৌমা? জিগ্যেস করুন তো কে আগে কাকে বেরিয়ে যাবার কথা বলেচে? হ্যাঁ খোকা বলতো? আপনার বৌমাই বল্লে না আমাকে বেরিয়ে যেতে? কেন, ওর বাবার বাড়ি?

—হ্যাঁ, ওর বাবার বাড়ি। আলবোৎ ওর বাবার বাড়ি। হারামজাদা, ফের যদি তুমি ওসব কথা মুখে এনেচ তবে তোমাকে আমি—

উপেন ভট্‌চাজ ওপরে উঠে চলে গেলেন। ভবতারণ চুপ করে বসে রইল তক্তপোষের এক কোণে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ ভবতারণ উঠে জামার পকেট হাতড়ে দু টাকার একখানা নোট বার করে স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে, এই দিলাম। ধার দেনা শোধ দিও। আমি এক্ষুনি চল্লাম, দেশলাই কে নিল আমার?

তারা বল্লে—খোকন, দেশলাইটা ঐ রয়েচে, দে তো—

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ভবতারণ জামা গায়ে দিতে দিতে বল্লে, এসেছিলাম অনেক আশা করে। তা এ বাড়ি আমি থাকবো না। এখানে আমার পোষাবে না বুঝলাম। কেউ যখন আমাকে দেখতে পারে না এ বাড়িতে। খাওয়া হোল না, শরীরটাও খারাপ। তা হোক্, যাবোই। আর আসচি নে। দ্যাখ্ খোকন, যাবি কলকাতায়? চল আমার সঙ্গে। মটোর কিনে দেবো, লবেঞ্চুস্ কিনে দেবো—

করুণা নিরুত্তর।

—যাবি?

—না।

—এসো আমার সোনা, আমার মাণিক, চলো আমার সঙ্গে—

এই সময়ে তারা এগিয়ে এসে স্বামীর হাত ধরে বল্লে, কেন পাগলামি করচো? বসো। এখনো অন্ধকার রয়েছে। এখন কোথায় যাবে? ছিঃ—

—ছাড়ো হাত—

ঝট্‌কা মেরে ভবতারণ হাত ছাড়িয়ে নিলে।

—তোমার মত ইতরের সঙ্গে আমি কথা বলিনি। আমি খোকনের সঙ্গে কথা বলচি—

—রাগ করে না—ছিঃ—

—ফের্ আবার? এইবার কিন্তু ভাল হবে না বল্‌চি। খবরদার আমার গা ছুঁয়ো না—

—আচ্ছা ছোঁব না। বোসো ওখানে।

—ফের কথা বলে? খোকন—ও খোকন যাবি আমার সঙ্গে? আয়—আর কখনো যদি এ ভিটেতে পদার্পণ করি তবে আমার—

করুণা মায়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়ে আছে। তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

সকাল বেলা। বেশ রোদ উঠেচে।

তারা স্বামীকে দুখানা পেঁপের টুকরো হাতে দিয়ে বল্লে, খাও। পেট ঠাণ্ডা হবে।

ভবতারণ এই ঘুমিয়ে উঠেচে। চোখ ভারি ভারি। পেঁপের রেকাবি হাতে নিয়ে বল্লে, উনি কোথায়?

—ওপরে।

—যাবেন না?

—তা কি জানি?

—খাবেন?

—উনি কবে খান? কাল সন্দের সময় এলেন, বল্লাম ভাত রেঁধে দিই। উনি বল্লেন, না।

—পেঁপে আর আছে? দিয়ে এসো না ওপরে।

—সে তুমি বল্লে তবে দেবো? সে দিয়ে এসিচি তুমি তখন ঘুমিয়ে।

—দিও। বুড়ো মানুষ।

—সে তোমাকে শেখাতে হবে না।

—খোকন—ও খোকন—শোন্—

—ও খেয়েচে। ওকে ডাকচো কেন? তুমি খেয়ে ফেলো। তোমার পেট ঠাণ্ডা হবে পেঁপে খেলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে?

এখনো গোলোযোগ যায় নি: ভাতে জল দিয়ে নুন নেবু দিয়ে তাই খাবো। তেল দাও নেয়ে আসি।

করুণা বাপের কাছে এসে বল্লে, কি বাবা?

এই নে, খা—

তারা বল্লে, আহা, কেন আবার—তুমি খাও—

এই সময় উপেন ভট্‌চাজ খড়ম পায়ে দিয়ে ওপর থেকে নেমে এলেন। ঘরে উঁকি দিয়ে বল্লেন—কে? ভবতারণ? ভাল পেঁপে, খা। ইয়ে বৌমা, আমি আসি। ওখানেই খাবো। ভবতারণ আজ আছিস্ তো?

ভবতারণ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, না বাবা, ওবেলা চলে যাবো। আপনি আসবেন না ওবেলা?

—আচ্ছা, তুই যাবার আগে আমি ফিরে আসবো। আমি—

এই সময় তারা ফিস্ ফিস্ স্বরে কি বল্লে স্বামীকে। ভবতারণ ডেকে বল্লে, বাবা—

—কি?

—এবেলা এখানে দুটো খাবেন, আপনার বৌমা বলচে। কই মাছ আনতে যাচ্ছি বাঁধালে। এক সঙ্গে বসে অনেকদিন খাইনি— কেমন?

জ্যোতিরিঙ্গণ

উপেন ভট্টচাজ্জ সম্মতি জ্ঞাপন করে রোয়াক থেকে উঠানে পা দিলেন। কি ভেবে এসে আবার বসলেন রোয়াকে।

পুত্রবধূ বল্লে—তামাক সেজে দেবো?

—দ্যাও দিকি।

ছেলে ভবতারণ নিজেই তামাক সেজে নিয়ে এল। বৃদ্ধ উপেন ভট্টচাজ চোখ বুজে হুঁকোয় টান দিতে দিতে চিন্তা করতে লাগলেন, এমন সকালবেলা কতকাল আসেনি তাঁর জীবনে। স্ত্রী মারা গিয়েচে আজ বোধ হয় বিশ বছর, ভবতারণ তখন এগারো বছরের বালক। তারপর থেকেই ছন্নছাড়া সংসারজীবন চলচে, আঁটসাঁট নেই কোনো বিষয়ে কারো। তার ওপরে দারিদ্র্য তো আছেই। হাতে পয়সা ছিল না বলেই ভবতারণকে লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি। লেখাপড়া শেখালে অত খারাপ হোত না সে। অবহেলিত পুত্রের প্রতি উপেন ভট্টচাজের মায়া হোল। কাল অত বকুনি দেওয়াটা উচিত হয়নি।

ভবতারণ বাড়ি ফিরে এল আটটার সময়। স্ত্রীকে বল্লে—দ্যাখো, কারে বলে ষশুরে কই। আধপোয়ার নামো নেই, ওপরে এক পোয়া, পাঁচ ছটাক। বাবাকে দ্যাখাও—

পুত্রবধূ বল্লে—এই দেখুন—

—বাঃ বাঃ—কত করে সের নিলে?

—সাড়ে তিন টাকা।

—তা হবে, যুদ্ধের সময় ছিল ভালো। এ দিন দিন কা হয়ে উঠলো—

অনেকদিন পরে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবাযত্ন জুটলো উপেন ভটচাজের ভাগ্যে। এমন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া কতকাল হয়নি। তিনি পড়ে থাকেন মজুমদারদের ঠাকুরবাড়িতে পেটের দায়েই তো। ছেলে

উপযুক্ত হয়নি, নিজেরই ছেলেটাকে সে খেতে দিতে পারে না। ওদের ভার লাঘব করবার জন্যেই তিনি পরের বাড়ি খান।

খাওয়াদাওয়ার পর উপেন ভট্চাজ দিবানিদ্রা দেবার জন্যে ওপরের ঘরে চলে গেলেন। পুত্রবধূ তামাক সেজে দিয়ে গেল। আঃ, কি আরাম। সব আছে তাঁর, অথচ নেই কিছুই।

আজ দিনটা একটা চমৎকার দিন। এমন দিন আবার কবে আসবে!

বারমেসে সজ্‌নে গাছে ফুল ফুটেচে। তালপাতা নড়চে বর্ষার সজল বাতাসে। ঘুমিয়ে পড়লেন উপেন ভট্চাজ। উপেন ভট্চাজের পুত্রবধূও আপন মনে আজ খুব খুশি। ছন্নছাড়া ভাঙা বৃহৎ বাড়ি আজ যেন কার পদস্পর্শে লক্ষ্মীর সংসারে পরিণত হয়েছে। দোতালায় শ্বশুরকে তামাক সেজে দিতে যাওয়ার সময় এই কথাই তার মনে হচ্ছিল। তার আছে সবাই। শ্বশুর, স্বামী, পুত্র—যা চায় মেয়েরা, এত বড় বাড়ি, জাজ্বল্যমান সংসার যাকে বলে। ওদের সকলের পাতে পাতে ভাত মাছ দিয়ে আজ কত সুখ পেয়েছে সে। ওদের খাইয়ে সুখ। ভাবতে ভাবতে সেও ঘুমিয়ে পড়লো।

ভবতারণ অন্যদিন খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিতে বেরোয় রায় পাড়ার হরু রায়ের নাতি অমূল্য রায়ের ওখানে। স্থলপথের যাত্রী দুজনেই। দুপুরের পর ভরা পেটে মৌতাত জমে ভালো।

আজ কিন্তু সে বাইরে গেল না। স্ত্রীকে ঘুমুতে দেখে সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হোল। কেন দুটো গল্প করতে কি হয়েছিল? তারাকে কি সে রোজ রোজ পায়? কত কষ্টে থাকে এই বাড়িতে একা। সে নিজে অক্ষম স্বামী, কিছু করবার পথ তার নেই সামনে।

সে ভালো হবে ভাবে, ভেবেচে কতবার। কিন্তু তা হবার যো

নেই। সে জানে কেন। সঙ্গ বড় খারাপ জিনিষ। সে-সব বন্ধুদের সঙ্গ তাকে এইখানে নামিয়েছে। জলপথ ও স্থলপথ, কোনো পথ বাকি রাখেনি। আজকের সংকল্প কাল উড়ে যাবে কর্পূরের মত।

তবুও আজকের দিনটি একটা সুন্দর ঝাঁকালো, শান্ত দিন হয়ে থাক তার জীবনে। তারাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বল্লে—চা আছে ঘরে? চা করো। বাবাকে দিয়ে এসো। আমিও একটু খাই—

—না। চা খায় না। নেবু আর নুন্ দিয়ে চিঁড়ের কথ্ করে দি—

স্ত্রী সত্যি তাকে যত্ন করবার চেষ্টা করে। তার অদৃষ্টে নেই, কার কি দোষ? তারা সত্যি ভালো মেয়ে বড্ড।

এদিকে দিবানিদ্রা ভেঙে উপেন ভটচাজ সবে উঠেচেন, অমনি পুত্রবধু গরম চায়ের গ্লাস নিরে এসে তাঁর হাতে দিলে। বিস্মিত চোখে পুত্রবধুর দিকে চেয়ে বল্লেন—কি? চা? বাড়িতে ছিল?

—ছিল।

—বেশ, বেশ।

পুত্রবধু হাসি মুখে বল্লে—আর কিছু খাবেন।

—হ্যাঁ, তা—কি খাওয়াবে?

—বেশ দোভাজা করে চিঁড়ে ভেজে নারকোল কোরা দিয়ে নিয়ে এসে দেবো?

—বেশ বেশ। কাঁচা লংকা অমনি ঐ সঙ্গে একটা এনো। আর শোনো, ভবতারণকে আর খোকনকেও দিও।

—তামাক দেবো বাবা?

—এখন না। চিঁড়ে ভাজা আগে খাই, তার পরে। বাঃ, মৌতাতটা নষ্ট করে দেবে বৌমা?

এমনি সুন্দর হাসিখুশির মধ্যে সেদিনের সূর্য্য ডুবে গেল জামদা'র বড় বিলের ওপারে।

সারাদিন কেউ কোথাও নেই।

ভবতারণ চলে গিয়েচে। যা সামান্য দুটি টাকা দিয়ে গিয়েচে তাতে পাঁচদিনের চাল 'কেনাও হবে না। উপেন ভটচাজ গিয়ে উঠেচেন মজুমদারদের ঠাকুর বাড়িতে।

একা রয়েচে তাঁর পুত্রবধূ সেই প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়িতে ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে রাত্রে। আবার কলাবাদুড় ওড়ে কড়িকাঠের খোপে খোপে, পেঁচা ডাকে ডুমুর গাছের নির্জ্জন অন্ধকারের মধ্যে, করুণা ঘুমের মধ্যে মাকে বলে—ও কিসের শব্দ মা? ওঠো—ওটা কি মা?

হিংয়ের কচুরি

আমাদের বাসা ছিল হরিবাবুর খোলার বাড়ির একটা ঘরে। অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে বাড়িটাতে বাস করতো। এক ঘরে একজন চুড়িওয়ালা ও তার স্ত্রী বাস করতো। চুড়িওয়ালাব নাম ছিল কেশব। আমি তাকে 'কেশবকাকা' বলে ডাকতাম।

সকালে যখন কলে জল আসতো, তখন সবাই মিলে ঘড়া, কলসি, টিন, বালতি নিয়ে গিয়ে হাজির হোত কলতলায় এবং ভাড়াটেদের মধ্যে ঝগড়া বকুনি সুরু হোত জল ভর্ত্তির ব্যাপার নিয়ে।

বাবা বলতেন মাকে, এ বাসায় আর থাকা চলে না। ইতর লোকের মত কাণ্ড এদের। এখান থেকে উঠে যাবো শীগ্‌গির।

কিন্তু যাওয়া হোত না কেন, তা আমি বলতে পারবো না। এখন মনে হয় আমরা গরীব বলে, বাবার হাতে পয়সা ছিল না বলেই।

আমাদের বাসার সামনে পথের ওপারে একটা চালের আড়ত, তার পাশে একটা গুড়ের আড়ত, গুড়ের আড়তের সামনে রাস্তার ওপর একটা কল। কলে অনেক লোক একসঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচি করে জল নেয়। মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে মারামারি পর্য্যন্ত হতে দেখেছিলাম একদিন।

জ্যোতিরিঙ্গণ

এই রকম করে কেটেছিল সে-বাসায় বছরখানেক, এক আষাঢ় থেকে আর এক আষাঢ় পর্য্যন্ত।

আষাঢ় মাসেই দেশের বাড়ি থেকে এসেছিলাম। দেশের বাড়িতে বাঁশবাগানের ধারে ধুত্‌রো ফুলের ঝোপের পাশেই আমি আর কালী দুজনে মিলে একটা কুঁড়ে করেছিলাম। কালীর গায়ে জোর বেশি আমার চেয়ে, সে সকাল থেকে কত বোঝা আশস্যাওড়ার ডাল আব পাতা যে ব'য়ে এনেছিল! কি চমৎকার কুঁড়ে করেছিলাম দুজনে মিলে, ঠিক যেমন সত্যিকার বাড়ি একখানা। কালী তাই বলতো। একটা ময়নাকাঁটা গাছের মোটা ডালে সে পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছিল, ও বলতো শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে কিংবা নষ্টচন্দ্রের রাতে রাত-চরা কাঠঠোকরা কিংবা তিওড় পাখি ওখানে ডিম পেড়ে যাবে।

এ সব সম্ভব হয়নি আমার দেখে আসা, কারণ আষাঢ় মাসেই গ্রাম থেকে চলে এসে কলকাতার এই খোলার বাড়িতে উঠেছি।

আমার কেবল মনে হয় দেশের সেই বাঁশবনের ধারের কুঁড়েখানার কথা, কালী আর আমি কত কষ্ট করে সেখানা তৈরি করেছিলাম, ময়না গাছের ডালে বাঁধা সেই পাখির বাসার কথা—নষ্টচন্দ্রের রাতে কাঠঠোকরা পাখি সেখানে ডিম পেড়েছিল কিনা কে জানে?

কলকাতার এ বাড়িতে জায়গা বড্ড কম, লোকের ভিড় বেশি। আমি সামনে টিনের বারান্দাতে সারা সকাল বসে বসে দেখি কলে পাড়ার লোক জল নিতে এসেচে, গুড়ের আড়তের সামনে গুড় নামাচ্চে গরুর গাড়ি থেকে, বাঁ কোণের একটা দোতলা বাড়ির জানলা থেকে একটি বৌ আমার মত তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। এই গলি থেকে বার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে একটা হিন্দুস্থানী দোকানদারের ছাতুর দোকান থেকে আমি মাঝে মাঝে ছাতু কিনে আনি। বড় রাস্তায়

জ্যোতিরিঙ্গণ

অনেক গাড়ি ঘোড়া যায়, আমাদের গ্রামে কখনো একখানা ঘোড়ার গাড়ি দেখিনি, দুচোখ ভরে চেয়ে চেয়ে দেখেও সাধ মেটে না, কিন্তু মা যখন তখন বড় রাস্তায় যেতে দিতেন না, পাছে গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ি।

আমাদের বাড়ি থেকে কিছুদূরে গলির ও-মোড়ে কতকগুলো সারবন্দি খোলার বাড়ি, আমাদেরই মত। সেখানে আমি মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তাদের বাড়ি-ঘর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত কি জিনিসপত্র আছে, আয়না, পুতুল, কাঁচের বাক্স, দেওয়ালে কেমন সব ছবি টাঙানো। এক এক ঘরে এক একজন মেয়েমানুষ থাকে। আমি তাদের সকলের ঘরেই যাই, বিকেলের দিকে যাই, সকালেও মাঝে মাঝে যাই।

ওই বাড়িগুলোর মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার নাম কুসুম। সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমিও তাকে খুব ভালবাসি। কুসুমের ঘরেই আমি বেশিক্ষণ সময় থাকি। কুসুম আমার সঙ্গে গল্প করে, আমাদের দেশের কথা জিগ্যেস করে, তাদের বাড়ি বর্দ্ধমান বলে কোন্ জায়গা আছে, সেখানে ছিল। এখন এই ঘরেই থাকে।

কুসুম বলে—তোমায় বড্ড ভালবাসি, তুমি রোজ আসবে তো?

—আমিও ভালবাসি। রোজ আসিই তো।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—আসসিংড়ি, যশোর জেলা।

—কলকাতায় আগে কখনো আসনি বুঝি?

—না।

বিকেলবেলা কুসুম চমৎকার সাজগোজ করতো, কপালে টিপ পরতো মুখে ময়দার মত কি গুঁড়ো মাখতো, চুল বাঁধতো—কি চমৎকার মানাতো

ওকে। কিন্তু এই সময় কুসুম আমাকে তার ঘরে থাকতে দিত না, বলতো—তুমি এবার বাড়ি যাও। এবার আমার বাবু আসবে।

প্রথমবার তাকে বলেছিলাম—বাবু কে?

—সে আছে। সে তুমি বুঝবে না। এখন তুমি বাড়ি যাও।

আমার অভিমান হোত, বলতাম—আসুক বাবু। আমি থাকবো। কি করবে বাবু আমার?

—না না তুমি চলে যাও। তোমাব এখন থাকতে নেই। অমন করে না লক্ষ্মীটি!

—বাবু তোমার কে হয়? ভাই?

—সে তুমি বুঝবে না। এখন যাও দিকি বাড়ি।

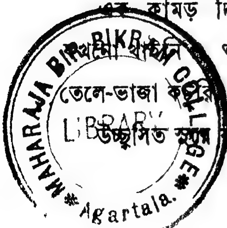
আমার বড় কৌতূহল হোত, কুসুমের বাবুকে দেখতেই হবে। কেন ও আমাকে বাড়ি যেতে বলে?

একদিন তাকে দেখলাম। লম্বা চুল, বেশ মোটাসোটা লোকটা—হাতে একটা বড় ঠোঙায় এক ঠোঙা কি খাবার। কলকাতার দোকানে খাবার কিনতে গেলে ঐরকম পাতার ঠোঙায় খাবার দেয়। আমাদের দেশে ঐ পাতা নেই; সেখানে হরি ময়রার দোকানে মুড়কি কি জিলিপি কিনলে পদ্মপাতায় জড়িয়ে দেয়।

কুসুম ঠোঙা খুলে আগে আমার হাতে একখানা বড় কচুরি দিয়ে বল্লে—এই নাও, খেতে খেতে বাড়ি যাও।

এক কামড় দিয়ে আমার ভারি ভাল লাগলো। এমন কচুরি কখনো খাইনি। আমাদেব গ্রামেব হরি ময়রা যে কচুরি করে, সে তেলে-ভাজা কচুরি এমন চমৎকার খেতে নয়।

উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্লাম—বাঃ! কিসের গন্ধ আবার।



কুসুম বল্লে—হিংয়ের কচুরি, হিংয়ের গন্ধ। ওকে বলে হিংয়ের কচুরি—এইবার বাড়ি যাও—

কুসুমের বাবু বল্লে—কে ?

—কলের সামনের বাড়ির ভাড়াটেদের ছেলে। বামুন।

কুসুমের বাবু আমার দিকে ফিরে বল্লে—যাও খোকা, এইবার বাড়ি যাও।

একবার ভাবলাম বলি, আমি থাকি না কেন, থাকলে দোষ কি ? কিন্তু কুসুমের বাবুর দিকে চেয়ে সে কথা বলতে আমার সাহসে কুলুলো না। লোকটা যেন রাগী মতো, হয়তো এক ঘা মেরেও বসতে পারে। কিন্তু সেই থেকে হিংয়ের কচুরির লোভে আমি রোজ বাঁধা নিয়মে কুসুমের বাবু আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। আর রোজই কি সকলের আগে কুসুম আমার হাতে দুখানা কচুরি তুলে দিয়ে বলবে—যাও খোকা, এইবাব খেতে খেতে বাড়ি চলে যাও—

কুসুমের বাবু বলতো—আহা, ভুলে গেলাম। ওর জন্যে খাস্তা গজা দুখানা আনবো ভেবেছিলাম কাল। দাঁড়াও কাল ঠিক আনবো—

আমার ভয় কেটে গেল। বল্লাম—এনো ঠিক কাল ?

কুসুমের বাবু হি হি করে হেসে বল্লে—আনবো আনবো।

কুসুম বল্লে—এখন বাড়ি যাও খোকা—

—আমি এখন যাবো না। থাকি না কেন ?

কুসুমের বাবু আমার এই কথার উত্তরে কি একটা কথা বল্লে আমি তার মানে ভালো বুঝতে পারলাম না। কুসুম ওর দিকে চেয়ে রাগের সুরে বল্লে—যাও, ওকি কথা ছেলেমানুষের সঙ্গে ?

বাড়ি গিয়ে মাকে বল্লাম—মা তুমি হিংয়ের কচুরি খাও নি ?

—কেন ?

—আমি খেয়েছি। এত বড় বড়, হিংয়ের গন্ধ কেমন।

—কোথায় পেলি?

—কুসুমের বাবু এনেছিল, আমায় দিয়েছিল।

—পাজি ছেলে, ওখানে যেতে বারণ করেছি না? ওখানে যাবে না।

—কেন?

—কেন কথার উত্তর নেই। ওখানে যেতে নেই। ওরা ভাল লোক না।

—না মা, কুসুম বেশ লোক। আমাকে বড্ড ভালবাসে। হিংয়ের কচুরি রোজ দেয়।

—আবার বলে হিংয়ের কচুরি? বাড়িতে খেতে পাও না কিছু? খবরদার ওখানে যাবে না বলে দিচ্ছি।

কুসুমের বাড় এর পরে আর দিন-দুই আদৌ গেলাম না। কিন্তু থাকতে পারিনে না গিয়ে। আবার মাকে লুকিয়ে গেলাম একদিন। কুসুম বল্লে—তুমি আসনি যে?

—মা বারণ করে।

—তবে তুমি এসো না। মা আবার বকবে।

—আসিনি তো দুদিন।

—এলে যে আবার?

—তোমায় ভালবাসি তাই এলাম।

—ওরে আমার সোনা। তুমি না এলে আমারও ভাল লাগে না। তুমি না এলে তোমার জন্যে মন কেমন করে।

—আমারও।

—কি করবো, তেমন কপাল করিনি। তোমার মা তোমায় পাছে বকেন তাই ভাবচি।

—মাকে বলবো না। আমার মন কেমন করে না এলে। আমি এখন যাই।

—সন্দের সময় এসো।

—ঠিক আসবো।

কুসুমের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সন্ধের সময় যাই। কুসুমের বাবু এসে আমায় দেখে বল্লে—এই যে ছোকরা। ক'দিন কেন দেখিনি? সেদিন তোমার জন্যে খাস্তা গজা নিয়ে এলাম, তা তোমার অদৃষ্টে নেই। দাও গো ওকে দুখানা কচুরি।

—গজা এনো কাল।

—আনবো গো বামুন ঠাকুর, ফলাবে বামুন! কাল অমৃতি জিলিপি আনবো। খেয়েচ অমৃতি?

—না।

—কাল আনবো, এসো অবিশ্যি।

—কাউকে বোলো না কিন্তু। মা শুনলে আসতে দেবে না।

—তোমার মা বকেন বুঝি এখানে এলে?

—হুঁ।

কুসুম তাড়াতাড়ি বল্লে—আরে ওর কথা বাদ দাও। ছেলেমানুষ পাগল, ওর কথার মানে আছে! তুমি বাড়ি যাও আজ খোকা। এই নাও কচুরি। খেতে খেতে যাও—

—না, এখানে খেয়ে জল খেয়ে যাই, মা টের পাবে।

—এখানে তোমাকে জল দেবো না। রাস্তার কল থেকে জল খেয়ে যেও।

কুসুমের বাবু বল্লে—কেন ওকে জল দেবে না কেন? কি হবে দিলে?

কুসুম ঝাঁজের সুরে বল্লে—তুমি থামো। বামুনের ছেলেকে হাতে

করে জল দিতে পারবো নি। এই জন্মের এই শাস্তি। খাবার দিই হাতে করে তাই যথেষ্ট।

আমার মনে মনে বড় অভিমান হোল কুসুমের ওপর। কেন আমি এতই কি খারাপ যে আমায় হাতে করে জল দেওয়া যায় না? চলে আসবার সময় কুসুম বার বার বল্লে—কাল সকালে কিন্তু ঠিক এসো। কেমন?

আমি কথা বল্লাম না।

পরদিন সকালে গিয়ে দেখি কুসুম বসে সজ্‌নের ডাঁটা কুট্‌চে। আমায় বল্লে—এসো খোকা—

—তোমার সঙ্গে আড়ি।

—ওমা সে কি কথা? কি করলাম আমি?

—তুমি বল্লে জল দেওয়া যায় না আমাকে। জল খেতে দিলে না কাল।

—এই! বসো বসো খোকা। সে তুমি বুঝবে না। তুমি বামুন, তোমাকে জল আমরা দিতে পারিনে। বুঝলে? কুলের আচার করচি, খাবে? এখনো হয়নি। সবে কুল গুড় দিয়ে মেখেচি—

এইভাবে কুসুমের সঙ্গে আবার ভাব হয়ে গেল। কুলের আচার হাতে পড়তেই আমি রাগ অভিমান সব ভুলে গেলাম। দুজনে অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। তারপর আমি উঠে মাখমের ঘরে যাই। মাখম কুসুমের পাশের ঘরে থাকে। ওর ঘরটি যে কত রকমের পুতুল দিয়ে সাজানো! একটা কাঠের তাকে মাটির আতা, আম, লিচু কতরকমের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস। অবিকল আতা। অবিকল আম।

মাখম বল্লে—এসো খোকা। ও সব মাটির জিনিসে হাত দিও না। বোসো এখানে এসে। ভেঙে যাবে।

—আচ্ছা, তুমি তামাক খাও কেন?

মাখম হাসিমুখে বল্লে—শোনো কথা। তামাক খায় না লোক?

—মেয়েমানুষে খায় বুঝি? কই আমার মা তো খায় না। বাবা খায়।

—শোনো কথা। যে খায় সে খায়।

—কুসুমের বাবু আমায় খাস্তা গজা দেবে।

—বটে! বেশ বেশ।

—তোমার বাবু কোথায়?

মাখম মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

—হিহি—শোনো কথা ছেলের—কি যে বলে!—হি হি—ও কুসুমি, শুনে যা কি বলে তোর ছেলে—

মাখমের বয়েস কুসুমের চেয়ে বেশি বলে আমার মনে হোত। কুসুম সব চেয়ে দেখতে সুন্দর। মাখমকে দিদি বলে ডাকতো কুসুম।

কুসুম এসে হাত ধরে আমাকে ওব ঘবে নিয়ে গেল। কুসুম আমায় বারণ করেছিল আর কারো ঘবে যেতে। আমি প্রকৃতপক্ষে যেতাম খাবার লোভে। কিন্তু অন্য মেযেদেব ঘরের বাবু কখন আসতো কি জানি। সুতরাং সে বিষয়ে আমায় হতাশ হতে হয়েছিল। কুসুম আমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে বকলে। বল্লে—অত শত কথা তোমার দরকার কি শুনি, তুমি ছেলেমানুষ? কোনো ঘরে যেতে পারবে না, বোসো এখানে।

—আমি প্রভার কাছে যাবো—

—কেন, সেখানে কেন? যা তা বলবে সেখানে গিয়ে আবার। বোকা ছেলে। খাওয়ার লোভ, না? এই তো দিলাম কুলচুর।

আমি আশ্চর্য্য হওয়ার সুরে বল্লাম—আমি চেয়ে খাইনি। প্রভাকে জিগ্যেস কোরো।

—বেশ, দরকার নেই প্রভার কাছে গিয়ে।

— একটিবার যাবো? যাবো আর আসবো।

সত্যি বলচি প্রভার ঘরে যাওয়ার কারণ ততটা লোভ নয়, যতটা একটা টিয়া পাখী।

টিয়া পাখীটা বলে—রাম, রাম, কে এলে? দূর ব্যাটা, কাকীমা, কাকীমা। আমি ঢুকে দাঁড়ালেই বলে—কে এলে? কে এলে?

—আমার নাম বাসুদেব।

—কে এলে? কে এলে?

আমি হেসে উঠলাম। ভারি মজা লাগে ওর বুলি শুনতে। অবিকল মানুষের গলার মত কথা—কে এলে? কে এলে?

প্রভা বাইরে থেকে বল্লে—কে ঘরের মধ্যে?

ও রান্নাঘরে রাঁধছিল। খুন্তি হাতে ছুটে এসেচে। খুন্তিতে ডাল লেগে রয়েচে। আমি হেসে বল্লাম—মারবে নাকি?

—ও! পাগলা ঠাকুর। তাই বলো। আমি বলি কে এলো দুপুরবেলা ঘরে।

—তোমার ঘরে কুলচুর নেই। কুসুম আমায় কুলচুর দিয়েচে। খুব ভালো কুলচুর।

—কুসুমের বড়নোক বাবু আছে। আমার তো তা নেই? কোথা থেকে কুলচুর আমচুর করবো।

—কুসুমের বাবু আমায় গজা দেবে।

—কেন দেবে না? মোড়ে অত বড় দোকানখানা কুসুমের পায়ে

সঁপে দিয়ে বোসেচে। ওখানকার কথা ছেড়ে ছাও। বলে—মানিনী, তোর মানের বালাই নিয়ে মরি—

ভয়ে ভয়ে বল্লাম—প্রভা, রাগ কোবো না আমার ওপর।

—না না রাগ করবো কেন। দুঃখের কথা বলচি। আমিও এক-পুরুষ বেশ্যে। আমরা উড়ে আসিনি। পনেরো বছর বয়সে কপাল পুড়লে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।

—কেন ঘব থেকে বেরিয়েছিলে ?

—সে সব দুঃখের কথা তোমার সঙ্গে বলে কি হবে। তুমি কি বুঝবে। বোসো, আমাব ডাল পুড়ে গেল। গল্প করলে পেট ভরবে না।

—আমি যাই ?

— এসো বান্নাঘরে।

প্রভাব বং কালো, খুব মোটাসোটা, নাকেব ওপর কালো ভোমরাব মত একটা জড়ুল। প্রভা একদিন আমাকে গরম জিলিপি আর মুড়ি খেতে দিয়েছিল। ওর ঘবে এত জিনিষপত্তব নেই, ওই খাঁচায় পোষা টিয়া পাখিটা ছাড়া।

প্রভা রান্না কঁবচে চালতের অম্বল। একটা পাথর বাটিতে চালতে ভেজানো। চালতে অনেকদিন খাইনি, দেশ থেকে এসে পর্য্যন্ত নয়। সেখানে আমাদেব মাঠে তালপুকুরের ধারে বড় গাছে কত চালতে পেকে আছে এ সময়।

বল্লাম—চালতে পেলে কোথায় প্রভা ?

—বাজারে, আবার কোথায় ?

—বেশ চালতে।

প্রভা আর কিছু বল্লে না। নিজের মনে রাঁধতে লাগলো।

আমি বল্লাম—তোমার বাবা মা কোথায় ?

—পাপমুখে সে সব কথা আর কি বলি।

—বাড়ি যাবে না?

—কোন্ বাড়ি?

—তোমাদের দেশের বাড়ি।

—যমের বাড়ি যাবো একেবারে।

—তোমাদের দেশের বাড়িতে কুল আছে? আমাদের গাঁয়ে কত কুলের গাছ।

প্রভা একথার কোন উত্তর দিলে না। আবার নিজের মনে রাঁধতে লাগলো। খানিক পরে সে একটা ঘটি উনুনের মুখে বসিয়ে চা তৈরি করে গ্লাসে আঁচল জড়িয়ে চুমুক দিয়ে চা খেতে লাগলো। আমায় একবার বল্লেও না আমি চা খাবো কি না। অবিশ্যি আমি চা খাইনে, চায়ের সর খাই। মা আমায় চা খেতে দেয় না। চায়ের মধ্যে যে দুধের সর ভাসে, মা তাই আমাকে তুলে দেয়।

প্রভা গল্প করতে লাগলো ওদের দেশের বাড়িতে কত গরু ছিল, কতখানি দুধ ওরা খেতো। ওদের বাড়ির ধারে ওদের নিজেদের পুকুরে কত মাছ ছিল। আর সে সব দেখতে পাবে না ও।

হঠাৎ প্রভা একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড করে বসলো। বল্লে—অম্বল দিয়ে দুটো ভাত খাবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম—খাবো। কুসুম টের না পায়।

প্রভা হেসে বল্লে—কুসুমের অত ভয় কিসের? টের পায় তো কি হবে? তুমি খাও বসে।

আমি সবে চালতের অম্বল দিয়ে ভাত মেখেছি, এমন সময় কুসুমের গলার শব্দ শোনা গেল—ও প্রভাদি, বামুনদের সেই খোকা তোর এখানে আছে? ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই, কতক্ষণ এসেচে পরের ছেলে।

আমি এঁটো হাতে দৌড়ে উঠে রান্নাঘরের কোণে লুকিয়ে রইলাম। প্রভা কিছু বলবার আগে কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে দেখতে পেলে। বল্লে—ওকি? কোণে দাঁড়িয়ে কেন? লুকানো হোল বুঝি? এ ভাত মেখেচে কে অম্বল দিয়ে? অ্যাঃ—

প্রভার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—আচ্ছা প্রভাদি, ও না হয় ছেলেমানুষ পাগল। তোমারও কি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে গেল? কি ব'লে তুমি ওকে ভাত দিয়েচ খেতে?

প্রভা অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—কেবল চালতে চালতে করছিল—তাই ভাবলাম অম্বল দিয়ে দুটো ভাত--

—না ছিঃ। চলো আমার সঙ্গে খোকা। এ জন্মের এই শাস্তি আমাদের, আবার তা বাড়াবো বামুনের ছেলেকে ভাত দিয়ে? চলো—হাত এঁটো নাকি? খেয়েচ বুঝি?

আমি সলজ্জস্বরে বল্লাম—না।

—চলো হাত ধুয়ে দিই—

কুসুম এসে আমার হাত ধরে বাইরের দিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে প্রভা বল্লে—আহা মুখের ভাত ক'টা খেতে দিলিনি ওকে। সবে অম্বল দিয়ে দুটো মেখেছিল—

—না, আর খেতে হবে না। চলো—

মায়ের শাসনের চেয়েও যেন কুসুমের শাসন বেশি হয়ে গেল। মুখের ভাত ফেলেই চলে আসতে হোল। উঠোনের এক পাশে নিয়ে গিয়ে আমায় হাত ধুয়ে দিতে দিতে বল্লে—তোমার অত খাই খাই বাই কেন খোকা? ওদের ঘরে ভাত খেতে নেই সে কথা মনে নেই তোমার? ছিঃ ছিঃ—ওবেলা কচুরি দেবো এখন খেতে। আর কক্‌খনো অমন খেও না। তাও বলি, এই না হয় ছেলেমানুষ—তুমি বুড়ো ধাড়ি,

তুমি কি বলে বামুনের ছেলের পাতে—ছিঃ ছিঃ লোকেরও বলিহারি যাই—

বলা বাহুল্য প্রভা এসব কথা শুনতে পায়নি, সে এদিকেও ছিল না।

বল্লাম—মাকে যেন বলে দিও না—

—হ্যাঁ আমি যাই তোমার মাকে বলতে! আমাব তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

—বল্লে মা মারবে কিন্তু।

—মাব খাওয়াই ভালো তোমার। তোমার নোলা জব্দ হয় তাহোলে—

বাড়ি ফিরতেই মা বল্লেন—কোথায় ছিলি?

—ওই মোড়ে।

—আর কোথাও যাসনি তো?

—না।

একদিন কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। সেদিন দোষটা ছিল, কুসুমেরই। সে আমাকে বল্লে—চলো খোকা বেড়াতে যাই—যাবে?

বিকেলবেলা। রোদ বেশি নেই। ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে দেখে আমি সভয়ে বল্লাম—মা বড় রাস্তা পার হতে দেয় না। বারণ করেচে।

—চলো আমি সঙ্গে আছি ভয় নেই।

বড় রাস্তা পার হয়ে আর কিছু দূরে একটা খোলার বস্তির মধ্যে আমরা ঢুকলাম। একটা সরু গলির দুধারে ঘরগুলো। যে বাড়িতে আমরা ঢুকলাম, সেখানেও সবাই মেয়েমানুষ, পুরুষ কেউ নেই। একজন মেয়ে বল্লে—আয় লো কুসুমি, কতকাল পরে—বাব্বাঃ, আমাদেরও কি আর নাগর নেই? তা বলে কি অমন করে ভুলে থাকতে হয় ভাই?

আমার দিকে চেয়ে বল্লে—এ খোকা আবার কে? বেশ সুন্দর দেখতে তো।

—বামুনদের ছেলে। আমাদের গলিতে থাকে। আমার বড্ড ন্যাওটো।

—বাঃ—বোসো খোকা, বোসো।

—ও ছেলের শুধু ভাই খাই খাই। খেতে দ্যাও খুব খুশি।

—তাই তো কি খেতে দিই। ঘরে কুলেব আচার আছে, দেবো?

আমি অমনি কিছুমাত্র না ভেবেই, বলে উঠলাম—কুলেব আচার বড্ড ভালবাসি।

কুসুম মুখ ঝামটা দিয়ে বল্লে—তুমি কি না ভালবাসো। খাবাব জিনিস হোলেই হোল। না ভাই, ওব সর্দ্দি কাশি হয়েচে। ও ওসব খাবে না। থাক্।

আমাব মনে ভয়ানক দুঃখ হোল। কুসুম খেতে দিলে না কুলচুব্। কখন হোল আমাব সর্দ্দি কাশি? কুলচুর আমি কত ভালবাসি।

খানিকটা সে বাডিতে বসবাব পরে আমবা অন্য একটা ঘরে গেলাম। তাবাও আমাকে দেখে নানা কথা জিগ্যেস কবতে লাগলো। বাডির তৈবি সুজি খেতে দিলে একখানা রেকাবি করে। তাও কুসুম আমায় খেতে দিলে না। আমাব নাকি পেটেব অসুখ।

সন্ধের খানিকটা আগে আমাকে নিয়ে কুসুম বড় রাস্তার ট্রাম লাইন পাব হয়ে এপারে এল। একখানা ট্রাম আসছিল। আমি বল্লাম—কুসুম, দাঁড়াও—ট্রাম দেখবো।

—সন্ধে হয়েচে। তোমাব মা বকবে।

—বকুক।

—ইস্! ছেলের যে ভারি বিদ্ধি!

—আচ্ছা কুসুম তুমি ওকথা বল্লে কেন? আমায় কুলচুর খেতে দিলে না। ওরা তো দিচ্ছিল।

—তুমি ছেলেমানুষ কি বোঝো। কার মধ্যে কি খারাপ রোগ আছে ওসব পাড়ায়। তোমায় আমি যার তার হাতে খেতে দেবো? যার তার ঘরের জিনিস মুখে করলেই হোল, তোমার কি। কার মধ্যে কি রোগ আছে তুমি তা জানো?

—আচ্ছা কুসুম 'নাগর' মানে কি?

—কিছু না। কোথায় পেলে একথা?

—ওই যে ওবা তোমায় বলছিল।

—বলুক। ও সব কথায় তোমার দরকার কি? পাজি ছেলে কোথাকার।

কুসুম আমায় বাড়ির পথে এগিয়ে দেবার আগে বল্লে—চলো, কচুরি এতক্ষণ এনেচে ও। তোমায় দিই—

—দাও। আমার খিদে পেয়েচে—

—কোন্ সময়ে তোমার পেটে খিদে থাকে না বলতে পারো? তোমার মাকে যদি সাম্‌না সাম্‌নি পাই তো জিগ্যেস করি ছেলের অত নোলা কেন?

—নোলা আছে তো বেশ হয়েচে। কচুরি দেবে তো?

—চলো।

—গজা এনেচে?

—তা আমি জানিনে।

—গজা কাল দেবে?

—গলির রাস্তাটা কি নোংরা! বাবারে বাবাঃ!

—গঙ্গা দেবে তো ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! এখন কচুরি নিয়ে তো রেহাই দাও আমায়।

সে রাত্রে কুসুম আমায় আমাদের কলটার কাছে এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মার কাছে সত্যি কথা বল্লাম। কুসুমের বাড়ি গিয়ে ছিলাম। কুসুম কচুরি খেতে দিয়েচে। মা খুব বকলেন। কাল থেকে আমায় বেঁধে রাখবেন বল্লেন। বাবাকেও রাত্রে বলে দিলেন বটে তবে বাবা সে কথায় খুব যে বেশি কান দিলেন এমন মনে হোল না।

পরদিন সকালের দিকে আমার জ্বর হোল। চার পাঁচদিন একেবারে শয্যাগত। একজন বুড়ো ডাক্তার এসে দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে গেল।

জানালার ধারেই আমাদের তক্তপোষ পাতা। একদিন বিকেলে দেখি রাস্তার ওপর কুসুম দাঁড়িয়ে আমাদের ঘরের উল্টো দিকের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে মাখম। মাখন এগিয়ে গিয়ে আরও ছুখানা বাড়ির পরে একখানা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমি ডাকলাম—ও কুসুম—

কুসুম পেছন ফিরে আমায় দেখতে পেল। মাখমকে ডেকে বল্লে—দিদি, এই বাড়ি—এই যে—

মা কলতলায়। কুসুম ও মাখম এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো।

কুসুম বল্লে—কি হয়েচে তোমার ? যাওনা কেন ?

মাখম বল্লে—কুস্মি ভেবে মরচে। বলে, বামুন খোকার কি হোল। আমি তাই বল্লাম, চল দেখে আসি।

বল্লাম—আমার জ্বর আজ পাঁচ দিন।

কুসুম বল্লে—তোমার মা কোথায় ?

—কুসুম তুমি চলে যাও। মা দেখলে পরে আমায় আর তোমাদের

ঘরে যেতে দেবে না। আমি সেরে উঠেই যাবো। চলে যাও তোমরা।

ওরা চলে গেল। কিন্তু পরদিন বিকেলে আবার কুসুম এসে রাস্তার ওপর দাঁড়ালো। নিচু সুরে বল্লে—যাবো ?

মা ঘরে নেই। বস্তিনাথদের ঘরে ডাল মেপে নিতে গিয়েচে আমি জানি। এই গেল একটু আগে। আমায় বলে গেল—ছোট খোকার দুধটা দেখিস্ তো যেন বেঁড়ালে খায় না, আমি বস্তিনাথদের ঘর থেকে ডাল নিয়ে আসি—

হাত দেখিয়ে বল্লাম—এসো—

ও জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্লে—কেমন আছ ?

—ভালো। কাল ভাত খাবো।

—দুটো কমলানেবু এনেছিলাম। দেবো ?

—দাও তাড়াতাড়ি।

—খেও।

—হ্যাঁ।

—অসুখ সারলে যেও—

—যাবো।

—কাল ভাত খাবে ?

—বাবা বলেচে কাল ভাত খাবো।

—কাল আবার আসবো। কেমন তো ?

—এসো। আমি না বল্লে জানালার কাছে এসো না।

—তাই করবো। আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবো। শিস্ দিতে পারো ?

—উঁহু! আমি হাত দেখালে এসো।

পরের দুদিন কুসুম ঠিক আসতো বিকেলবেলা। একদিন প্রভা

দেখতে চেয়েছিল বলে ওকেও সঙ্গে করে এনেছিল। প্রভাও ছুটো কমলালেবু দিয়েছিল আমায়, মিথ্যে কথা বলবো না। বালিশের তলায় লেবু লুকিয়ে রেখে দিতাম, মা ঘরে না থাকলে খেয়ে ছিব্ড়ে ফেলে দিতাম রাস্তার ওপর ছুঁড়ে।

সেরে উঠে ছুদিন কুসুমের বাড়ি গিয়েছিলাম।

তারপরেই এক ব্যাপার ঘটলো। তাতে আমাদের কলকাতার বাসা উঠে গেল, আমরা আবার চলে এলাম আমাদের দেশের বাড়িতে। মা একদিন সোডাওয়াটার-এর বোতল খুলতে গিয়ে হাতে কাঁচ ফুটিয়ে ফেল্লে। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। হাতের কব্জি থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগলো। বাসার সব লোক ছুটে এল বিভিন্ন ঘর থেকে। কোণের ঘরের বিপিনবাবু এসে মার হাতে কি একটা ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলে। কিন্তু মায়ের হাত সারলো না। ক্রমে হাতের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠলো। মা আর রান্না করতে পারেন না, যন্ত্রণায় কাঁদেন রাত্রে। ডাক্তার এসে দেখতে লাগলো। আমার মামার বাড়ির অবস্থা ভাল। চিঠি পেয়ে মেজমামা এসে আমাদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন মামার বাড়িতে।

আষাঢ় মাসের শেষ। তাল ছুএকটা পাকতে সুরু হয়েচে। মামার বাড়ির গ্রামে মস্ত বড় একটা পুকুর আছে মাঠের ধারে, তার পাড়ে অনেক তালগাছ। আমি বেড়াতে গিয়ে প্রথম দিনই একটা পাকা তাল কুড়িয়ে পেলাম মনে আছে।

মার হাত সেরে গেল মামার বাড়ি এসে। ভাদ্রমাসের শেষে আমরা দেশের বাড়িতে চলে এলাম। কলকাতা আর যাওয়া হোল না। বাবাও সেখানকার বাসা উঠিয়ে দেশে চলে এলেন।

জ্যোতিরিঙ্গণ

সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরের কথা।

কলকাতায় মেসে থাকি, আফিসে কেরানীগিরি করি, দেশের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র থাকে। আমার পুরোনো কলেজ-আমলের বন্ধু শ্রীপতির সঙ্গে বসে ছুটির দিনটা কি গল্প করতে করতে শ্রীপতি বল্লে— কাল ভাই সন্ধের পর প্রেমচাঁদ বড়ালের ষ্ট্রীট দিয়ে আসতে আসতে— দুধারে মুখে রং—হরিব্‌ল!

—আমিও দেখেছি। ঐ পথ দিয়েই তো আসি। আমি কিন্তু ওদের অন্য চোখে দেখি। ওদের আমি খুব চিনি। ওদের ঘরে এক সময়ে আমার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল।

আমার বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—তোমার!

—হ্যাঁ ভাই আমার। মাইরি বলচি।

—যাঃ, বিশ্বাস হয় না।

—আচ্ছা, চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়। প্রমাণ করে দেবো।

বছর পনের আগে একবার নন্দরাম সেনের গলি খুঁজে বার করে মাখমের বাড়ি যাই। কুসুম, প্রভা কেউ ছিল না। ওই দলের মধ্যে মাখমই একমাত্র সে খোলার বাড়িতে ছিল তখনো।

শ্রীপতিকে নিয়ে আমি চলে গেলাম নন্দরাম সেনের গলিতে। মাখম এখনো সেই বাড়িতেই আছে। একেবারে শনের নুড়ি চুল মাথায়, যকৃথি বুড়ীর মত চেহারা। একটি দাঁত নেই মাড়িতে।

আমি যেতে মাখম বল্লে—এসো এসো। ভালো আছ?

— চিনতে পারো?

—ওমা, তোমায় আর চিনতে পারবো না? আমাদের চোখের সামনে মানুষ হোলে। ভালো কথা, কুসুমের খোঁজ পেইচি!

—কোথায়? কোথায়?

—শোভাবাজার ষ্ট্রীটে একটা মেস-বাড়ীতে ঝি-গিরি করে। ঢুকেই বাঁ হাতে। মন্দিরের পাশের ভাঙা দোতালা। আমায় সেদিন নিয়ে গিয়েছিল মন্দিরে নীল পূজো দিতে। তাই আমায় দেখালে।

শ্রীপতিকে নিয়ে সে মেস-বাড়ি খুঁজে বার করলাম। সন্ধে তখনো হয়নি, নিচে রান্নাঘরে ঠাকুরকে বল্লাম—তোমাদের ঝি কোথায় গেল ?

—বাজারে গিয়েছে বাবু। এখুনি আসবে। কেন ?

—দরকার আছে। তার নাম কুসুম তো ?

—হ্যাঁ বাবু।

একটু পরে একজন লম্বা রোগা ঝি শ্রেণীর মেয়ে-মানুষ সদর দরজা দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। ঠাকুর বল্লে—ও কুসুম, এই বাবুরা তোমায় খুঁজচেন।

আমি ঝিয়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বাল্যদিনের সেই সুন্দরী কুসুম এই! মাখমের মত অত বুড়ী না হোলেও কুসুমও বুড়ী। বুড়ী ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যাবে না। ওর মুখ আমার মনে ছিল, সে মুখের সঙ্গে এ বৃদ্ধার মুখের কিছুই মিল নেই। ঠাকুর না বলে দিলে একে সেই কুসুম বলে চেনবার কিছু উপায় ছিল না।

কুসুমও আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—আমায় খুঁজচেন আপনারা? কোত্থেকে আসচেন ?

—মাখমের কাছ থেকে।

—কোন্ মাখম ?

—নন্দরাম সেনের গলির মাখম বাড়িউলি।

—ও! তা আমায় খুঁজছেন কেন ?

—চলো ওদিকে। কথা আছে।

—চলুন খাবার ঘরে।

খাবার ঘরে গিয়ে বল্লাম, কুসুম আমায় চিনতে পারো ?

—না বাবু।

—নন্দরাম সেনের গলিতে আমাদের বাসা ছিল। আমি তখন আট বছরের ছেলে। আমার বাবা মা ছিলেন ঈশ্বর নাপিতদের বাড়ির ভাড়াটে। মনে হয় ?

কুসুম হেসে বল্লে—মনে হয় বাবু। তুমি সেই পাগলা ঠাকুর! কত বড় হয়ে গিয়েচ। বাবা মা আছেন ?

—কেউ নেই।

—ছেলেপুলে ক'টি ?

—চার পাঁচটি।

—বোসো বোসো বাবা।

আরও অনেক কথাবার্ত্তার পরে কুসুম আমাদের বসিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেল। খানিক পরে চট্ করে কোথা থেকে একটা শালপাতার ঠোঙায় খাবার এনে দুখানা থালাতে আমাদের দুজনকে খেতে দিলে।

আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হোল। বড় বড় হিংয়ের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিংয়ের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না—তা জানিনে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধুসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেচে একেবারে নন্দরাম সেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধেবেলায় ঠোঙা হাতে হিংয়ের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।

দুই দিন

১২৮৫ সাল। সতেরোই শ্রাবণ।

ভাবনহাটি গ্রামের রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশচন্দ্র রায় আজ বিয়ে করে বৌ নিয়ে আসবে বলে রামচন্দ্র রায়ের ভাঙা চণ্ডী-মণ্ডপে কয়েকজন লোক জমেছে। রামচন্দ্র রায় ছেলের বিয়েতে যেতে পারেন নি, আনন্দ নাড়ু ভাজার দিন তেল জ্বলে উঠে হঠাৎ রান্নাঘরের খড়ের চালে আগুন ধরে যায়। আগুন নেবাতে গিয়ে রামচন্দ্র রায়ের দুই হাত পুড়ে ঘা হয়েচে করতালুতে। সেজন্যে তিনি ছেলের বিয়েতে যান নি, বরকর্ত্তা করে পাঠিয়েছিলেন ভায়রা ভাই তেবরের গোপেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে।

রামচন্দ্র রায়ের অবস্থা ভাল নয়। দুখানা মাত্র ছ'চালা ঘর। কয়েক বিঘে ধানের জমি। বাড়ির পেছনে একটা খালের এক চতুর্থাংশের মালিকানা স্বত্ব আছে, তাতে বছরে ত্রিশ চল্লিশ মন মাছ পান। এর দাম দশটাকা হিসেবে মন ধরলে তিন চারশো টাকা। এ ছাড়া অন্য কোনো আয় নেই। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে এক রকম সংসার চলে যায়।

রামচন্দ্র রায়ের ছেলে পরমেশের বয়েস তেইশ বছর। ছাত্র বৃত্তি পাশ করে স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে মুহুরিগিরি কাজে ঢুকেচে। মাসিক বেতন ছ'টাকা।

ইতিমধ্যে সে গ্রামের সমবয়সীদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

তাদের বাপ মা তাদের বলে, সোনার চাঁদ ছেলে দেখগে যা রামু রায়ের ছেলে পরমেশ। ছাত্রবৃত্তি পাশ করলে দিব্যি—আবার ছ টাকা মাইনেতে মুহুরিগিরিতে ঢুকেচে। ওর উন্নতি ঠেকায় কেডা? তোরা শুধু বাড়ি বসে খাবি আর পাশা খেলবি চণ্ডীমণ্ডপে বসে।

ছ'টাকা মাইনে পাওয়ার কথাটা একটু রটে গেল চারিধারে। ফলে ছেলের বিবাহের জন্যে নানা গ্রাম থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগলো। রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ধরে বসলেন আঁকড়ে এক কথা—একশো এক টাকা বর পণ দিতেই হবে। দশভরি সোনা। তা ছাড়া দান সামগ্রী, বরের গরদ আলাদা।

অনেকে বল্লে, বাপরে, কি দেখে অত টাকা বরপণ দিতে যাবে লোকে? একশো টাকা বরপণ কারা পায়? যাদের ভালো জমিজমা আছে। তোমার কি আছে বাপু? ছেলে অবিশ্যি স্বীকার করি অল্প বয়সে চাকরীটা পেয়েছে ভালোই। কিন্তু ঐ যা ছেলে দেখেই দেওয়া। কম চাওয়া তো নয়। দশ ভরি সোনার দামই ধবো আঠারো টাকা ভরি হিসেবে একশো আশি টাকা। না না ও চলে না।

আবার অনেকে বলে চাওয়ার দিন এসেছে তাই চায়। কই তুমি আমি তো চাইতে সাহসও করিনে। হীরের টুকরো ছেলে। এই বয়েসে উন্নতি করেচে কেমন! আট টাকা তো ওর মাইনে হোল বলে। ওকে দশভরি সোনা দেবে না তো দেবে কাকে?

অনেক মেয়ে দেখা ও উভয় পক্ষের যাতায়াতের পরে অবশেষে গোবরাপুরের তারিণী চক্রবর্ত্তীর বড় মেয়ে পতিতপাবনীকে রামচন্দ্র রায়ের বেশ পছন্দ হোল, তাঁরা বরপণ ও দশভরি সোনা দিতেও চাইলেন।

আজ সেই কনেকে নিয়ে পরমেশ বাড়ি আসচে।

কিন্তু ইতিমধ্যে রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতেই কথা উঠেছে—তাইতো, বৌ আসবার আগে, নাড়ু ভাজার দিনই ঘরে আগুন লেগে গেল। শ্বশুরের হাত পুড়ে গেল।...এ কি অলুক্ষণে বৌ রে বাবা!

রামচন্দ্র রায়ের স্ত্রী স্বামীকে নাড়ু ভাজার দিন শেষ রাত্রেই কথাটা বলেছিলেন। তখন শেষ রাত্রে দধি-মঙ্গলের শাঁখ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসানো হাতের যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্বামীকে জাগিয়ে তুলে রমেশের মা বল্লেন— ওগো শোনো—

—কি গা?

—আমার মনডা ভাল বলচে না। সেই থেকে আমিও ঘুমুই নি। আমার কথা শোনো, ওখানে ছেলের বিয়ে ভেঙে দাও –

—পাগল! আজই বিয়ে, আজ বিয়ে ভেঙে দেবো?

—খুব দেওয়া যায়। অলুক্ষণে বাণে ঘরে আগুন লাগে ভিটেতে পা দিতে না দিতে? আমার খোকা বেঁচে থাকুক, তার মুখের দিকে চেয়ে সংসারে সব করতে পারি তো ভারি একটা মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া যায় না? কাল রাত্রে যারা যারা নাড়ু ভাজতে এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই একথা বলেচে—দিগম্বর চাটুয্যের বৌ, ন' খুড়ি, ও পাড়ার মঙ্গল ঠাকরুণ, কাশী চক্কত্তির শাশুড়ি, আমাদের মনমতি, ময়না, এরা ছেলেমানুষ এরাও বলেছিল।

রামচন্দ্র রায় একটুখানি ঘাবড়ে গেলেন। ছেলের শুভ বিবাহের দিনটিতে এ সব কি বিভ্রাট রে বাবা। বল্লেন—আচ্ছা, দেখবো, সেখানে আগে যাই তো—

—ছেলেকে আমি পাঠাবো না কিন্তু।

—তবে দধিমঙ্গলের শাঁখ বাজালে কেন? ও সব লোক হাসাহাসির

মধ্যে আমি নেই। একটা নিরীহ মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে আমি পারবো না।

—সর্ব্বনাশ কিসে হোল?

—ও কথা বোলো না গিন্নি। পরের দুর্দ্দিনটা নিজের মত দেখতে শেখো। আজ তার মেয়ের বিয়ে, মেয়েরও দধি মঙ্গলের শাঁখ বাজলো, কত লোক কুটুম্ব এসেচে তাঁদের বাড়ি। কি সমাচার, না বর এলো না। মেয়ে দো-পড়া হয়ে গেল। কান্নাকাটি উঠলো চারিদিকে, রান্নাবান্নার জোগাড় সব নষ্ট। শত্রুরা মুখ টিপে হেসে মুখে আবার গা ঘেঁসে দুঃখু জানাতে এল। কি দিন ভাবো দিকি? ও সব ছেড়ে দ্যাও, পবেব মন্দ করতে পারবো না, এতে আমাদেব ছেলের খারাপ হবে না গিন্নি, ভালো হবে। তুমি ওর মা, তুমি ভালো মনে ওকে আশীর্ব্বাদ কবো। তোমার পায়ের ধুলোতে ওর সব মঙ্গল।

পরমেশের মা স্বামীকে বড় মানতেন। স্বামীর কথায় নরম হয়ে গেলেন। উনি যখন বলচেন, তখন কোনো ভয় নেই। উনি আমার চেয়ে অনেক বোঝেন। যা ভালো বোঝেন করুন। আমি মেয়ে মানুষ কি বুঝি?

তারপর বেলা হোল। বরযাত্রী ভোজনের যজ্ঞি চড়ে গেল। প্রায় ষাটজন বরযাত্রী হবে। তারা খেয়ে দেয়ে সব রওনা হয়ে চলে গেল, কিন্তু রামচন্দ্র রায় গেলেন না। যেতে পারলেন না। সেই পোড়ার ঘায়ে বড় যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করলো, একটু জ্বর মত হোল দুপুরের দিকে। তাঁর ভায়রা ভাইয়ের হাতে বরকর্ত্তার দায়িত্ব তুলে দিয়ে রামচন্দ্র রায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন কোণের ছোট্ট ঘরে।

স্ত্রী সন্ধ্যার পরে ঘরে ঢুকে বল্লেন—হ্যাঁগা, ঘুমিয়েচ ?

—না।

—এ কি হোল ?

—কি হোল ?

—তোমার জ্বর, তুমি খোকার বিয়েতে যেতে পারলে না, একি কম কষ্ট আমার। ভেবে দ্যাখো সেই খোকা আমাদের। আমার মন মোটেই ভাল নিচ্ছে না। চোখের জল ফেলছিনে পাছে খোকার অমঙ্গল হয়। কি অলুক্ষণে বৌ আসচে সংসারে যে গ্যাছে না উঠতেই এক কাঁদি !

—গিন্নি, আবার সেই কথা ? জ্বর মানুষের হয় না ? জ্বর হয়েচে বলে একজন নিরীহ মেয়ের উপর রাগ করো কেন, তাকে অলুক্ষণে বর্লই বা কেন ? কি দোষ তার ?

—কি থাবে রাত্তিরে ? ও বেলা এত যজ্ঞি, তুমি কিছু মুখে দিলে না—

—একটু সাবু করে দিও। আর কিছু ভেবো না, ভগবানের নাম নিয়ে গিয়ে শুয়ে থাক। যে আসচে, তাকে তুমি আশীর্ব্বাদ করো মন খুলে।

সেই নতুন বৌ নিয়ে পরমেশ এখুনি বাড়ি আস্‌চে। কেননা দূরে ঢোলেব শব্দ পাওয়া গেল। গরীবের ঘবের ঠাট বাট, আত্মীয়া কুটুম্বিনীবা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, শাঁখ নিয়ে দোরের বাইরে রাস্তার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

পরমেশের মা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন, চোখে তাঁর ঔৎসুক্য, মুখে অনিশ্চয়তার হাসি।

রাস্তার মোড়ে বরকনের পালকি দেখা গেল।

পেছনে বাজনদার ভক্ত মুচি ও তার দল।

পাল্কির এ পাশে গোপেশ্বর চক্কত্তি, পাত্রের বড় মেশো।

সকলেই এগিয়ে গেল।

কে একজন চেঁচিয়ে বল্লে—দুধ আলতার খোরা ঠিক কর আগে।

গ্রাম্য বৌঝিবা ঘিরে দাঁড়ালো। পোঁ পোঁ শাঁখ বেজে উঠলো। সুগঠিত দেহ যুবক পরমেশ রায় পালকি থেকে নেমে মার পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করলে। মা গিয়ে নববধুকে হাত ধরে পালকি থেকে নামালেন।

আগে থেকে কৌতূহল চঞ্চল হাতে বধূর ঘোমটা খুলে মুখ দেখলেন, হাতে দিলেন দুগাছা সোনাব বালা। তাঁব শাশুড়ি, রামচন্দ্র রায়ের স্বর্গগতা মাতৃদেবী একদিন এই বালা জোড়া দিয়ে তাঁব মুখ দেখেছিলেন এই ভিটেতে পা দেওয়ার দিনে।

পুত্রবধুর মুখ দেখে খুশী হলেন পবমেশেব মা। কাঁটাল তলায় বরণের পিঁড়ি পাতা ছিল, পুত্র ও পুত্রবধুকে আশীর্ব্বাদ করে ঘরে তুললেন। বাঁশ বনের মধ্যে বাড়ি।

অনেক রাত্রে লক্ষী পেঁচা ডাকচে বাঁশবনেব মাথায়। ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে বনে। বধূ কি একটা ডাকে ভয় পেয়ে ঘুমেব ঘোরে শয্যা-সঙ্গিনী ছোট ননদ হৈমবতীকে জড়িয়ে ধরলে।

—ওকি বৌ, ভয় কি? ও শেয়াল ডাকচে—

নববধু ঘুম ভেঙে হেসে ননদের মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ মেলে চাইলে। কানের মাকৃড়ি দুটো ঠিক করে নিলে। হৈমবতী হেসে বল্লে—রও একটা দিন। কালই তো ফুলশয্যা। কাল থেকে দাদার কাছে শোবে, ভয়ভাবনা কিছুই থাকবে না। ছট্‌ফট্ করে মরচো, আমরা বুঝি নে বুঝি?

জ্যোতিরিঙ্গণ

নববধূ সলজ্জ কণ্ঠে বল্লে— ওমা!

ওই দিনটির পরে দীর্ঘ আটষট্টি বছর কেটে গিয়েছে। আজ তেরো শো তিপান্ন সালের তেরোই শ্রাবণ। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এন্. রায়ের আজ মাতৃশ্রাদ্ধ। লোকজনে বাড়ি পরিপূর্ণ।

ভাবনহাটি গ্রামে এঁদের বড় দোতলা বাড়ি, বৈঠকখানা, পূজোর দালান। এন্. রায়ের পিতা ৺পরমেশচন্দ্র রায়ের আমলে দুখানা মাত্র খড়ের চালাঘর ছিল। পরমেশ রায়ের অবস্থা সামান্যই ছিল। স্থানীয় জমিদারি কাছারীতে নায়েবী করে কষ্টে স্বষ্টে তিনটি ছেলেকে মানুষ করে গিয়েছিলেন। চারটি মেয়েকেও মোটামুটি ভালই পাত্রস্থ করেছিলেন।

বড় ছেলে নৃপেন্দ্রনাথ রায় জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন, আজ সাত আট বছর পেন্সন্ নিয়েচেন। তাঁর দুই ছেলে, একটি গত মহাযুদ্ধে আই, এম, এস্ মেজর ছিল। এখন ভবানীপুরে ডাক্তারি করে। ছোটটি এই বছরে নিজে কনট্রাক্টরির আপিস খুলেচে কলকাতায়। বিগত যুদ্ধে ধানবাদ অঞ্চলে কন্ট্রাক্টরী করে অনেক টাকা রোজগার করেছে। ভবানীপুরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে সে গত ফাল্গুন মাসে তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ি কিনেচে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে। নৃপেন্দ্রনাথ রায় বকুলবাগানে বাড়ি করেছিলেন—ছোট একতলা বাড়ি বটে, তবে বেশ চওড়া কম্পাউণ্ড-ওয়ালা, ফুল বাগান আছে বাড়ির সামনে। চাকুরী জীবনের অর্থ দিয়ে বছর ষোল সতেরো আগে এই বাড়িটা তিনি করেছিলেন, এখনো ছেলেরা এই বাড়িতেই থাকে। তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েচেন কলকাতাতেই। বলা বাহুল্য, সম্পন্ন ঘরেই।

নৃপেন বাবু চাকুরী জীবনের প্রথম দিকে পৈতৃক ভিটেতে এই বড়

দোতলা বাড়ি করেন। পুজোর দালানে কয়েক বছর দুর্গোৎসবও করেছিলেন। তখন পরমেশ রায় বেঁচে ছিলেন।

পিতার পরলোক গমনের পর নৃপেন বাবু কয়েক বছর দেশে যাতায়াত করেছিলেন, তারপর আর বড় একটা আসতেন না। মাকে নিয়ে যেতে চাইতেন কর্ম্মস্থানে, বৃদ্ধা বলতেন—না বাবা, আমার কাছে শ্বশুরের এই ভিটেই গয়া কাশী। এ ফেলে কোথাও যাবো না। বৌমার শরীর এখানে টেঁকে না ম্যালেরিয়াতে, বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও সঙ্গে।

তখনো পর্য্যন্ত নৃপেন বাবু স্ত্রীকে বৃদ্ধা মায়ের কাছেই রেখেছিলেন।

ব্যস, ভাবনহাটির বাস উঠে গেল।

শুধু বুড়ী থাকে, বড় বাড়ির ঘরে প্রদীপ দেয়। ছেলেদের তৈরি বাড়ি, কত আনন্দের, কত আহ্লাদের। লোকের কাছে বলে সুখ, দেখিয়েও সুখ। ছোট ছেলেও এই বাড়ি করতে টাকা দিয়েছে, দুই ভাইয়ের টাকাতে বাড়ি, তবে খোকা নৃপেন বেশি টাকা দিয়েছে। ছোট ছেলে বীরেন দাদা-শ্বশুরের পসারে বসে গোয়াড়ি কেষ্টনগরে ওকালতি করে, সেখানে শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি বাড়িঘর সব তার। সে ক্বচিৎ ভাবনহাটি আসে। তার অবস্থা মন্দ নয়।

পরমেশ রায়ের পরলোকগমনের পর বুড়ী অনেক দিন বেঁচে ছিল। আশি বছর বয়েস হয়েছিল মরবার সময়। একবার বড় ছেলে নৃপেন রায়ের খুব অসুখ করে। বুড়ী ভাবনহাটি থেকে ছেলেকে দেখতে যায় বহরমপুরে। তখন নৃপেন রায় বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। বুড়ী বলেছিল—তোকে রেখে আমি যাবই খোকা—কোনো ভাবনা নেই, তুই সেরে উঠবি। আমি এই পায়ের ধুলো দিলাম তোর মাথায়, এই তোর বড় ওষুধ।

প্রায় পঁচিশ বছর এই বাড়িতে একা প্রদীপ দেওয়ার পরে এবার

বুড়ী স্বামীর ভিটের পুণ্য মৃত্তিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন গত ২রা ফাল্গুন।

প্রকাণ্ড শ্রাদ্ধ সভা। মেজব বাবু সব দেখাশুনো করে বেড়াচ্ছেন—বুড়ীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র। সুন্দব গৌববর্ণ চেহারা, চোখে চশমা। কাকে বলচেন—কনট্রোলারকে লিখে এক মন ময়দা অতিকষ্টে জোগাড় করেছিলাম—আর কলকাতাব রেশন কার্ডে কিছু কিছু কলেক্ট করে—ভাবনহাটি গ্রামের লোক খুব খুশি হয়েছে।

এরা গ্রামেব মধ্যে বড় লোক, অনেকদিন পরে দেশে এসেছে, মাতৃশ্রাদ্ধ করচে, একটা বড় ভোজ দেবে। তবে মুস্কিল এই যে না মেলে আটা ময়দা, না মেলে চিনি। এরা বড় লোক তাই যেখান থেকে হোক জোগাড় করেচে এই বাজারে। শ্রাদ্ধসভা একটা দেখবার জিনিস হয়েচে।

বড় সামিয়ানার নিচে শ্রাদ্ধবেদী। তেবটি নাতি মুণ্ডিত মস্তকে যখন দীর্ঘ সারিতে কুশাসনে বসে ভুজ্যি উৎসর্গ করতে বসে গেল—তখন গ্রামের বুড়ী চক্কত্তি গিন্নি বল্লেন—আহা হা, ভাগ্যিমানি চলে গেল! কি ভাগ্যিই নিয়ে এসেছিল! আজ সোনার চাঁদেরা বসে দেখো ভুজ্যি উচ্ছ্যগ্যও করচে। এ ভাগ্যি কি সবার হয়। বট্‌ঠাকুরের কি ছিল, দুখানা চালা ঘর। আমরা প্রথম ঘর করতে এসে দেখেছি। দিদি আর কত বড় ছিলেন আমার চেয়ে—না হয় দশ বছরের। সেই বাড়িতে রাজ অট্টালিকা তুলেছে ছেলেরা, আবার নাতিরা হয়েচে একেবারে রাজা। এমন ভাগ্যি নিয়ে কজন মেয়ে মানুষ বসুমতীতে আসে বলো—

নাতি মানে শুধু ছেলের ছেলেরা নয়, চার মেয়ের ছেলেরাও আছে।

নৃপেন রায়েব ছোট ছেলে কণ্ট্রাক্টর পরিতোষ বেদী থেকে হেঁকে বল্লে—বিজয়, গাড়ি গিয়েচে ?

বিজয় বিনীত ভাবে বল্লে—দারোগা বাবুব মেয়ে ছেলে আনতে গিয়েছে গাড়ি। এখনো ফেরেনি।

—ফিরলে সাবডেপুটির বাড়ির মেয়েদের আনতে পাঠাতে হবে—এবার বড়খানা পাঠিও।

—যা জল-কাদা স্যার, গাড়ি চালানো বড় দায় হয়েচে। বড় গাড়ি বেরিয়ে গিয়েচে রাণাঘাটে ছানা আনতে।

—যে করে হোক, একটা দুটো দিন চালিয়ে নিতে হবে।

পাঁচ মাইল দুরবর্ত্তী মহকুমা টাউন থেকে নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আনবার জন্যে দুখানা নিজেদের মোটর এরা কলকাতা থেকে এনেচে। রাণাঘাট এখান থেকে অনেক দুব, ভালো রাস্তাও নেই, সেখানে গাড়ি পাঠানোর কথায় পরিতোষ বল্লে, সেখানে গাড়ি পাঠাতে কে বল্লে ? সে তো ষোল মাইলের কম নয়—

বিজয় বল্লে—সতেরো মাইল স্যার।

—যত সব ষ্টুপিড্!·· তারপর একখানা টায়ার গেলে কি স্প্রিং ভাঙলে এ বাজারে জোগাড় করাই কঠিন—যা রাস্তা! ভালো গাড়ীখানাই ওই রাস্তায় পাঠালে!

এই সময়ে জিপ গাড়িতে মহকুমা হাকিম ও দুজন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এসে নামলেন।

মেজর রায় বেদী থেকে বল্লেন, আসুন, আসুন—ওরে গাড়ি থেকে কি কি আছে নামিয়ে নে—আসুন দয়া করে—

মহকুমা হাকিম মিঃ সেন পূর্ব্বে ছোকরা বয়সে নৃপেন রায়ের অধীনে সার্কেল অফিসারের কাজ করেচেন মেদিনীপুরে, কাঁথি মহকুমায়। জিপ্

থেকে নেমে মিঃ সেন বল্লেন—আপনার বাবা? ও! নমস্কার স্যর—আচ্ছা .আচ্ছা, আপনি কাজ আরম্ভ করুন, আমাদের জন্য ভাববেন না। উই আর কোয়াএট এ্যাট্ হোম—

—কে আছিস্, ওরে! সিগারেটের টিন বার করে দে ওঁদের—চায়ের ব্যবস্থা আগে কর।

এই সময় গোয়ালারা দই আর ক্ষীরের বাঁক নিয়ে উঠোনের এক স্থানে এসে দাঁড়ালো। ও পাশে ছোট চালাঘরে মিহিদানা ও দরবেশ ভিয়ান হচ্ছে, লুচির ময়দা মাখা হচ্ছে—সে ঘর থেকে একজন উঠে এসে গোয়ালাদের দই আর ক্ষীর দেখে নামিয়ে হিসেব করে নিতে লাগল।

জার্ম্মাণ সিলভারের ট্রেতে চা দেওয়া হচ্ছে সামিয়ানার চেয়ারে বসে যেসব ভদ্রলোক শ্রাদ্ধ দেখছেন, তাঁদের এবং বিশেষভাবে মহকুমার হাকিম ও তাঁর দুজন সঙ্গীকে।

গ্রামের সাধারণ লোকও সামিয়ানার একপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখচে। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হয়েছে। অপূর্ব্ব দৃশ্য। তেরোটি সোনার চাঁদ নাতি এক সঙ্গে ভুজ্যি উৎসর্গের মন্ত্র পাঠ করচে।

একটু দূরে সেই কাঁটাল গাছটা। যখন এটা অল্প কয়েক বছরের চারা তখন এরই তলায় দুধে আলতা গোলা পাথরের খোরায় পরমেশ রায়ের নববধূ এসে দাঁড়িয়েছিল বরণের সময়, পাশেই আল্‌পনা দেওয়া পিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিলেন নবযুবক পরমেশ রায়। সাতষট্টি বছর আগের এ খবর সভাস্থ কোনো লোক জানতো না, জানবার কথাও না।

অনুশোচনা

বালাদাস আপ্তে সকালে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ ববিবার, তাতে পাপ স্বীকারকারীদের দল আর একটু পর থেকেই আসতে সুরু করবে। স্নান সেরে তিনি তাড়াতাড়ি তৈরি হ'তে লাগলেন ভজন-মন্দিরে যাবার জন্যে।

বালাদাস আপ্তে কংকন প্রদেশের টুস্নুঘাট ও পান্‌জিম অঞ্চলেব একজন নাম-করা লোক। গোয়া থেকে যাতায়াতের বড় সড়কের ওপর সেণ্ট্ জেভিয়াবেব যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য মন্দির অবস্থিত, বালাদাস সেখানকার সহকারী পুবোহিত, সাধারণ উপাসনা কবেন না বড় একটা, রবিবার সকালে পাপ-স্বীকাব গ্রহণ কবেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। বালাদাসেব পবিত্রতার জন্যে সকলে তাঁকে খুব মানে, ভয়ও করে। কনফেশন্যালের ক্ষুদ্র ঘুলঘুলি দিয়ে মস্ত বড় জনারের ক্ষেত আর নিচু পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর দৃশ্য দেখতে দেখতে অপরাধী ভক্ত এক একবার যখন বালাদাসেব দীর্ঘ দাড়ির দিকে চায়, তখন সত্যই নিজেকে সে ঘোব পাপী ও অসহায় মনে না করে পারে না।

বালাদাস জর্ডনেব পবিত্র জলেব আধার থেকে নিজে একটু জল মাথায় দিয়ে ক্যাম্বিসের চটের মত লম্বা গাউন পড়ে সেণ্ট্ জেভিয়ারের ধর্ম্মমন্দিরেব ঘুলঘুলি জানালায় গিয়ে বসেন টুলের ওপর। গত বিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসচেন তিনি। তার আগে গোয়ায় একজন মেসন্ ব্যবসায়ীর নকলনবিশ ছিলেন।

খুব সকালে প্রথমেই এসেচে একজন চাষী লোক।

বালাদাস তাঁর বাঁধা কাজ কলের মত করে যান। চাষী লোকের মাথায় জর্ডনের জল ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ল্যাটিন মন্ত্র ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করে চলেন ঃ—

আউট নন্‌কমিটিস্ সনকোমিটিস্ ও ডেলা জেস্থ
ননকমিটিস্ সন্‌কোমিটিস্ ও ইমিড্ ত্রিস্ মারি
হিপোক্রিটিএ নিহিল স্থালভিটর এ আউট্—

তারপর সরল গ্রাম্যকৃষককে জিগ্যেস করেন গম্ভীরস্বরে—কি কি দোষ বলিয়া যাও। পারত্রিকের সভায়, ভগবান সিংহাসনে আসীন। দেবদূতগণ ভেঁপু বাজাইয়া শেষ বিচারের দিন তোমার কৃত সমুদয় গল্পরাশি সকলের কাছে প্রচার করিতেছে। তুমি কি কিছু লুকাইয়া রাখিতে চাও?

সংযত সাধুভাষার বাদ্যে চাষা ভীত ও স্তব্ধ হয়ে পুরোহিতের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কিছু লুকোবো না হুজুর। সোমবার সন্দেতে সলোমন বালকৃষ্ণ যে কুমড়োর ক্ষেত করেচে পাশেই, সেখান থেকে দুটো কুমড়োর জালি না বলে নিয়ে —

বালাদাস ধমক দিয়ে বল্লেন—বলো চুরি রূপ মহাপাপ—

—আজ্ঞে, চুবিরূপ মহাপাপ করেছি। মঙ্গলবার কিছু নেই। বুধবার—

—মঙ্গলবার কিছু নেই? ভেবে দ্যাখো। প্রত্যেক অস্বীকৃত পাপের জন্যে সেণ্ট্ জেভিয়ারের পবিত্র বেদীতে স' পাঁচ আনা—

—মেরী মাতার দোহাই হুজুর, মঙ্গলবার আর কিছু নেই—

—আচ্ছা বলে যাও। বুধবার—

—আমার ক্ষেতের খাম আলু আর সাস্তারা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল বুরুথ টুডু আর তার ছেলে সল্ টুডু, তাদের ঢিল ছুঁড়ে পা ভেঙে দিয়েছি—

—পা ভেঙে ?

—হাঁ হুজুর। পা একেবারে ভেঙে ; মিথ্যে কথা বলবো কেন ?

—আর তুমি যখন অপরের ক্ষেত থেকে চুরি করলে তখন বুঝি পাপ হোল না ?

—আজ্ঞে—

—বলে যাও। বৃহস্পতিবার। পবিত্র সেণ্ট্ টেরেসা বোজার পবিত্র স্মৃতিতে পুত বৃহস্পতিবার। পুরোহিত হাঁটু গেড়ে বসে উক্ত সেণ্ট্ টেরেসার উদ্দেশে আভূমি প্রণাম করলেন। চাষাও তাঁর দেখাদেখি তাই করলে। তারপর বল্লে—হুজুর, বৃহস্পতিবার একজনের ধার শোধের কথা ছিল— দিইনি।

—ইচ্ছে করে ? মনে ছিল ?

—হাঁ হুজুর। টাকাটা হাতছাড়া করতে কষ্ট হচ্ছিল।

—হুঁ। ধার করবার বেলা মনে থাকে না সে সব ? টাকা শোধ দিয়েছ ?

—না হুজুর।

—আত্মপাপ-শোধনকারীদের উচিত পাপ স্বীকারের দিনই গির্জ্জা থেকে ফিরে গিয়ে পূর্ব্বের ত্রুটি সংশোধন করা। আজই টাকা শোধ দেবে। তারপর ?

—তারপর, শুক্রবার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে ওকে বলেছিলাম তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও—

—শনিবার ?

আজ্ঞে—আজ্ঞে—

—বলো।

চাষা দুবার ঢোঁক গিলে বল্লে—আজ্ঞে ব্যাপারটা একটু—

—বলো।

—আজ্ঞে ও পাড়ার মঙ্গলদাসের শালী এসেছে পান্‌জিম্ থেকে। তাকে দেখবার জন্যে রাস্তার ইঁদারার পাশে যখন মেয়েরা চান করছিল, তখন বড় ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে দেখছিলাম।

বালাদাস দুই গালে হাত দিয়ে বল্লেন—কি সর্ব্বনাশ! কেন?

—আজ্ঞে তা যখন বলতেই এসেছি তখন বলবো। মঙ্গলদাসের শালী নাম-করা সুন্দরী পান্‌জিমের। সেখানে কি নাচঘরের কাজ করে। অমন গাইতে, নাচতে কেউ জানে না এ দেশে। গরবা নাচ খুব ভাল নাচে। খুব ভাল নাচ, সেবার এসে নেচে খুব নাম করে গিয়েছিল যে।

বালাদাসের অস্পষ্ট মনে পড়লো শুনেছিলেন বটে, পান্‌জিমের একটী সুন্দরী মেয়ে গরবা পরবে হিন্দুদের উৎসব-দিনে বটতলায় অদ্ভুত নাচ নেচেছিল।

তিনি ভ্রুকুটি করে বল্লেন—হুঁ। বড় উৎসাহ দেখা যাচ্চে যে! ক'বার দেখেছিলে?

—আজ্ঞে, তা চারবার।

—চারবার?

—আজ্ঞে হাঁ হুজুর। মিথ্যে কথা কেন বলবো।

—না তুমি সত্যাগ্রহী পল্। মেয়েটি কত বড় বল্লে?

—আজ্ঞে তা যুবতী। লেখাপড়া জানে। মঙ্গলদাসের সংসারের অর্দ্ধেক খরচ তো সেই পাঠায় পান্‌জিম্ থেকে হুজুর।

—কি নাম?

—সখীবাই।

—আচ্ছা যাও।

চাষা চলে গেল।

নিজের অপরাধের ভারে তার মন এত ভারাক্রান্ত যে বাড়িতে গিয়ে সে রাঙা মাদ্‌সা চালের ভাত আর খামআলুর তরকারী খেতেই পারলে না। কংকন উপকূল গোধুম উৎপন্ন করে না। ভাদ্রমাসে জনার আর এই মাদাসা ধানের চাষ উঁচু জমিতে জন্মায়—অন্য নীচু জমিতে হৈমন্তী ধান।' মাদ্‌সা ধান ষাটদিনে পাকে বলে গরীব চাষীরা অর্দ্ধেক জমিতে এর চাষ করে, সকালে উঠে ঐ ধানের রাঙা মিষ্টি ভাত পেট ভরে খেয়ে মাঠের কাজে বেরিয়ে যায়।

দুপুর ঘুরে গেল। মাঠে বসে বসে চাষা ভাবলে কাজটা খারাবি হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সে জন্যে বকুনিও যথেষ্ট খেয়েছে সে মাননীয় পুরোহিত বালাদাসের কাছে।

তবে একটা কথা।

সখীবাই এখানে চিরকাল থাকতে আসেনি।

তিনি চারদিন পরে সে পান্‌জিমে চলে যাবে। যাবেই।

আজ না হয় সে জনার ক্ষেতের কাজ শেষ করে বিকেলে ফিরবার পথে সোজা বাড়ি না গিয়ে ওপাড়া দিয়ে একটু ঘুরে সখীবাইকে আর একবার দেখে যাবে এখন।

ও রকম মেয়েছেলে এদিকে হরগামেশা বড় একটা আসে না। না হয় এই অপরাধের জন্যে সে আগামী রবিবারে বাতি দেবে সেণ্ট্‌ জেভিয়ারের দরগায়। পুরোহিত কিছু জরিমানা করবেন একই অপরাধ দুবার করবার জন্যে।

একটাকা স-পাঁচ আনা। তা দেবে সে। গোয়ার পাইকারদের কাছে একগাড়ী কুমড়ো বিক্রি করলে উঠে আসবে এখন ও পয়সা।

কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে সে গুটি গুটি চললো মঙ্গলদাসদের

পাড়ার দিকে। আস্তে আস্তে সে ইঁদারার অদূরবর্ত্তী বড় ডুমুর গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। ডুমুরেব যে ঝাড় ঝাড় কাঁদি নেমেছে বৃদ্ধ মহাপুরুষদের দাড়ির মত, তাবই ওপাশে কে যেন একজন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে!

—কে রে?

চাষা গুঁড়ির এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে গিয়ে দেখলে ক্যাম্বিসের চটের গাউন পবে লম্বা চুলদাড়ি কাঠের চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে ডুমুব ঝোড়েব তলায় চোবেব মত দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং বালাদাদ পুরকোয়াস আপ্তে, পুরোহিত।

দাদু

ঠাকুবদাদা আমাব শৈশবেব অনেকখানি জুড়ে আছেন। সমস্ত শৈশব-দিগন্তটা জুড়ে আছেন। ছেলেবেলায় জ্ঞান হয়েই দেখেছি আমাদের বাড়ীতে তিনি আছেন।

তাঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় একশো। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখেছি তিনি আমাদের পশ্চিমের ঘরের রোয়াকে সকাল থেকে বসে থাকতেন। একটা বড় গামলায় গরম জল করে দিদি তাঁকে নাইয়ে দিত।

ঠাকুরদাদা চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। তাঁকে সকালে হাত ধরে বোয়াকে নিয়ে এসে তাঁর জায়গাটিতে বসিয়ে দিতে হ'তো। তামাক সেজে দিতো দিদি। কেবল মা ঠাকুরদাদার ভাতের থালাটি নিয়ে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতেন। দিদি আবার তামাক সেজে দিত।

কিছুক্ষণ পবে ঠাকুবদাদা বসে-বসে আপনমনে কি বকতেন। একটু বেশি বেলায় বাবা নায়েবী কবে কাছারী থেকে ফিবে বাড়ি ঢুকতেই ঠাকুরদাদা অমনি কান খাড়া কবতেন।

—কে এল? হরিশ?

—হ্যাঁ বাবা—

—বাবা হরিশ, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে—

—সে কি বাবা, আপনাকে এখনো ভাত দেয়নি?

—না বাবা। খিদেব মরচি, অ হবিশ। ভাত দিতে বলে দে—

বাবার বয়েস পঞ্চাশেব ওপব। মাথার চুল প্রায় সব সাদা হয়ে গিয়েছে, বেশ মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস চেহারা, সবাই বলে বাবা না কি দেখতে সুপুরুষ।

বাবা মাকে অনুযোগ করলেন—আচ্ছা, বাবাকে এখনো ভাত দাও নি? ছি ছি, এত বেলা হোল।

মা বলতেন—ও মা, সে কি গো! দশটার সময় যে আমি নিজের হাতে খাইয়ে এসেচি!

বাবা চেঁচিয়ে ডেকে বল্লেন—ও বাবা—

—কি হরিশ?

আপনাকে আপনার বৌমা খাইয়ে এসেচে যে? কি বলচেন আপনি?

—না না, অ হরিশ. মিথ্যে কথা। আমারে কেউ ভাত দেয়নি, না খেয়ে মলাম আমি —

বলেই ঠাকুরদাদা ছেলে মানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ করে কান্না সুরু করে দিলেন।

মা বাগ করে বলে উঠলেন— বুড়ো বাহাত্তুরে, মরেও না, সাত কাল জ্বালাবে! তোমার সাধেব হিমি গিয়ে তোমায় খাওয়াক মাথাক— আমি আব যদি কাল থেকে তোমায় দেখি, তবে আমি বেণী মুখুয্যের—

বাবা দুঃখিত স্বরে বল্লেন— আহা হা, বড়বৌ।—ছেলে-পিলের সামনে—

—কি ছেলে-পিলের সামনে? কে না জানে সোহাগের হিমির কথা—বাহত্তুবে বুড়ো, চার কালে গিয়ে ঠেকেচে—

—আহা হা! বড়বৌ। অমন করে গুরুজনকে বলতে আছে? ছিঃ ছিঃ, তে'মাব মুখখানা আজকাল বড্ড—

ঠাকুবদাদা তখনো কিন্তু কাঁদচেন ছেলে মানুষের মত।

কান্নার মধ্যে ডাকলেন—অ হরিশ!

যেন অসহায় আর্ত্ত বালক তার একমাত্র আশ্রয়স্থল পিতাকে ডাকচে।

বাবা জামা-টামা না খুলেই ছুটে গেলেন, সান্ত্বনার সুরে বললেন— কি বাবা, কি?

—আঁমি ভাঁত খাঁবো—আঁমি না খেঁয়ে ম'লাম অ হঁরিশ। ওরা আঁমায় ন'া খেঁতে দিয়ে মাঁরবে—খুঁৎ—খুঁৎ—

—বাবা, কাঁদবেন না। কাঁদতে নেই। ছিঃ—অমন কাঁদতে আছে?

মা অমনি এ রোয়াক থেকে বলে উঠলেন—আ মরণ, বুড়ো

বাহাত্তুরের মরণ ত্থাখ না, যেন দু'বছরের খোকা, ছেলের কাছে কেঁদেই খুন। যমের ভুল এমনো হয়।

বাবা বলেন—আঃ, চুপ করো না বড়বৌ—কি কর?

ঠাকুরদাদা আবার বলেন—খিদে পেয়েচে—ভাত খাবো—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দেখচি—আপনি চুপ করুন—

অবশেষে আবার সামান্য দু'টি ভাত বাবা নিয়ে দিয়ে দিলেন। ঠাকুরদাদা দিব্যি খেতে বসে গেলেন আবার! মুখে আর হাসি ধরে না।

আমরাও ঠাকুরদাদার কাণ্ড দেখে হেসে বাঁচিনে।

এমনি এক দিন নয়, মাসের মধ্যে দশ দিন হোত। ইতিমধ্যে দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল—

বাবাকে দেখতাম, ঠাকুরদাদার যত কিছু কাজ নিজের হাতে করতেন। কিন্তু তাঁর সময় নেই, সকালে উঠে সন্ধ্যাহ্নিক কোরে জল-বাতাসা খেয়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন কাছারীর কাজে। দুপুরে এসে খেয়ে সামান্য বিশ্রাম করে কাজে বেরুতেন, ফিরতে রাত আটটা ন'টা বাজতো। এসেই ঠাকুরদাদার ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করতেন—বাবা, শরীর ভালো আছে? এদিকে ঠাকুরদাদাও সারা দিনের যত অভাব-অভিযোগের কাহিনী জমিয়ে রাখতেন ছেলের সামনে পেশ করবার জন্যে সেই সময়।

—আর বাবা, শরীব ভালো। একটু তামাক, তা কেউ ত্থায় না। টিকে ভিজে, আগুনও ধরলো না। আজ এমন মশা কামড়াতে লাগলো দুপুর বেলা, মশারিটা কেউ টাঙিয়েই দিলে না—এই ত্থাখো না পিঠটা—

তার পর কাঁদো-কাঁদো সুরে বললেন—তুই একটু হাত বুলিয়ে দে হরিশ—

বাবা বসে বসে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

—তুই বাড়ী না থাকলে আমাকে সব অগ্রাহ্যি করে। এক ঘটি জল চাইলে সময়মত গ্যায় না বাবা—

– সত্যি তো! আহা! আমি সব বলে ঠিক করে দেবো অখন—

—দিস্। ভালো করে বলে দিয়ে যাস্ তো—

—দেবো।

—তোর খাওয়া হয়েচে?

—না বাবা, এই তো এলাম।

—যা তুই, হাত-পা ধুয়ে জল-টল খা—তোকে পেট ভবে খেতে দিচ্চে তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—দেখি সবে আয় তো? একটু মোটা-সোটা হলি, না সেই রকমই আছিস্। জানিস্, ছেলেবেলায় তোর শরীর ছিল এম্‌নি রোগা। তোর গর্ভধাবিণী এক দিন বললে, খোকার জন্যে ছাগলের দুধের ব্যবস্থা কবো। তখন মেহেবপুরে নীল কুঠীতে কাজ করি। সেখানেই তোর জন্ম জানিস তো? হ্যাঁ মেহেবপুরে—ইয়ে—ঐ কি বলছিলাম ভুলে গেলাম—আজকাল কিছু মনেও থাকে না—

—ছাগলেব দুধ।

—হ্যাঁ, ছাগলের দুধ আনতে বললে তোর গর্ভধারিণী। সাহেবের একটা বড় ছাগল ছিল, মালীর সঙ্গে সড় করে ফেললাম। দু'টাকা করে দেবো—আর সে আধ সের করে ছাগলেব দুধ আমায় দেবে—

বাবা ওঠেন না সেখান থেকে, যতক্ষণ ঠাকুরদাখা একটু শান্ত না হন।

ভাত খেয়ে বাবার সঙ্গে গল্প করে ঠাকুরদাদা খুশি মনে বলেন—তা হোলে তুই এখন যা হবিশ, খেয়ে নিগে— দুধ পাচ্ছিস তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—ভালো করে দুধ খাবি। দুধেই বল।

—না বাবা, দুধ ঠিক খাচ্চি।

বাবা চলে গেলেন। যাবার আগে ঠাকুরদাদাকে বিছানায় শুইয়ে নিজের হাতে একটা মোটা চাদর ওঁর গায়ে ঢেকে দিলেন।

—চাদর খুলবেন না বাবা, ঠাণ্ডা লাগবে—

মা বকতেন—হোল, বাপের সেবা? বাব্বাঃ, এমন কীর্ত্তিও কখনো দেখিনি!

বাবা একটু লজ্জা ও সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন—আঃ, চুপ করো—

—কেন চুপ করবো? বুড়ো বাপের আবদার যেন দু'বছরের খোকার আবদার—এমন কাণ্ড যদি কখনো দেখেচি!

—না দেখেচ না দেখেচ, থামো তুমি। ঐ যে ক'দিন বুড়ো আছে, তার পর আর—

—সে সবাই জানে, তার পর কি আর তুমি বুনোপাড়ার দিগম্বর বুনোর সেবা করবে? এসো, দু'টো খেয়ে নিয়ে আমার মাথা কিনবে এসো—

সেদিনই গভীর রাত্রে আমরা সবাই ঘুমিয়ে যখন, ঠাকুরদাদা নিজের ঘর খুলে হাতড়ে হাতড়ে বাইরের রোয়াকে এসে ডাকচেন—অ বৌমা, অ হরিশ—

বাবা ধড়মড় করে উঠে বাইরে এসে বল্লেন—কি বাবা, কি হয়েচে? কি হয়েচে?

—বাবা হরিশ?

—কি হয়েচে?

—বৌমা আমায় এখনো ভাত দিলে না। রাত কত হয়েচে ছাখ্‌ তো—আমি বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভাত হয়নি এখনো?

বাবা অবাক!

মা ঘুম-চোখে উঠে বল্লেন—কি?

—বাবা ভাত চাইচেন—

—বাব্বাঃ, হাড়-মাস কালি হয়ে গেল। ঢের ঢের সংসার দেখেচি, ঢের ঢের শ্বশুর দেখেচি—কিন্তু এমনধারা কাণ্ডকারখানা কখনো শুনিওনি, কখনো দেখিওনি—

—চেঁচালে কাজ চলবে? ও কি? সব সময়—

ইতিমধ্যে আমার নির্ব্বিকার ঠাকুরদাদা, যিনি চোখে ভাল দেখেন না, কানেও ভাল শোনেন না, আবার ডেকে উঠলেন—অ হরিশ! অ বৌমা!

—যাই বাবা, যাচ্চি—

—আমাকে ভাত দিয়ে যাও—খিদে পেয়েচে—

বাবা গিয়ে ঠাকুরদাদাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—অবোধ শিশুকে যেমন লোকে সান্ত্বনা দেয়। তিনি খেয়েচেন সন্ধ্যার পরেই, তাঁর বৌমা ভাত দিয়ে গিয়েচে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে। মনে নেই তাঁর? তাঁকে ভাত না দিয়ে কি বাড়ীর কেউ খেতে পারে? এখন রাত দু'টো। এখন কি ভাত খেতে আছে? এখন খেলে তাঁর অসুখ করবে। কাল সকালেই—খুব ভোরেই তাঁকে খেতে দেওয়া হবে, রাত তো ভোর হয়ে গেল। অমন করলে সবারই মনে কষ্ট দেওয়া হবে। অমন কি করা উচিত? ছিঃ—

ঠাকুরদাদা বালকের মত আশ্বস্ত হয়ে বল্লেন—খেইচি?

—হ্যাঁ বাবা। আমার কথা বিশ্বাস করুন—মাগুর মাছ এনেছিলাম

আপনার জন্যে হাট থেকে কিনে—তাই দিয়ে ভাত খেয়েচেন. সত্যি বলচি, আপনার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলচি নে। চলুন, শোবেন আসুন—ঠাণ্ডা লাগবে—ঘরের মধ্যে আসুন—

—আচ্ছা, আচ্ছা—

—আসুন—

বাবা হাত ধরে ঠাকুরদাদাকে ঘবেব মধ্যে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে শুইয়ে দিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লেন।

মা বল্লেন—সহজে মিটলো ?

—মেটাতে জানলেই মেটে। এখন থেকে বাবার জন্যে দু'টো ভাত রেখে দিলে কেমন হয় ?

—হ্যাঁ। তার পর ওই বুড়ো বয়েসে পেট ছেড়ে দিলে এই শেষ রাত্তিরে গিলে, তখন ঠ্যালা সামলাবে কে শুনি ?

বাবা ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, যে এত কাল সামলে আসচে, সেই সামলাবে। কিন্তু তা তিনি বলেন না। নীববে গিয়ে আবাব নিজের ছোট্ট খাটটিতে শুয়ে পড়েন।

কাছারীর কাজে বাবাকে কয়েক দিনের জন্যে গোয়াড়িতে গিয়ে থাকতে হোল।

যাবার সময় বার বার মাকে বলে গেলেন, ঠাকুবদাদার যেন কোনো অসুবিধে না হয়। অযত্ন না হয় এ কথাটা বলতে বোধ হয় সাহস করলেন না, তা হোলে ধুন্ধুমার ঝগড়া বেধে যাবে। ঠাকুরদাদাকে গিয়ে বললেন—বাবা, আমি গোয়াড়ি যাচ্ছি, এই 'পাঁচ-ছ' দিন দেরি হবে। একটু বুঝে-শুঝে চলবেন, আপনার বৌমাও তো কাজের লোক, ছেলে-পুলে নিয়ে বিব্রত।

—কবে আসবি ?

বুধবার নাগাৎ।

—আজ না গেলে হোত না ? শনিবারের বারবেলা। নিশিকান্ত তরফদার বলতো, মেহেরপুরের কুঠীর জমানবিশ ছিল, শনিবারের বারবেলা –

—কে বল্লে আজ শনিবাব ?

—তবে কি বার ?

—শুক্রবার।

—তা কি করে হয় ? তুই বল্লি পাঁচ দিন দেরি হবে, তবে আজ শনিবার হোল না ?

—বাবার এত হিসেব এখনো মাথায় আছে ! পাঁচ-ছ দিন বল্লাম যে, আপনি ভাববেন না, কোনো অসুবিধে হবে না আপনার।

বাবা তো চলে গেলেন, এদিকে দু'দিন বেশ কাটলো। তারপরই ঠাকুরদাদা উৎপাত সুরু করলেন। রোজ সন্ধ্যের পর অভ্যাস মত বলেন—অ হরিশ !

কেউ উত্তর দিলে না।

মা আমাদের চোখ টিপে বারণ করে দিলেন বাবা বাড়ি আসেননি সেকথা বলতে, কারণ তাহোলে ঠাকুরদাদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন।

—অ হরিশ ! বাড়ি এলি ? অ হরিশ !

আমি মায়ের শিক্ষামত বল্লাম—না, এখনো আসেননি বাবা।

—আজ কখন কাছারী গেল ? আমাকে বলে গেল না ?

আমরা উত্তর দিইনে।

—অ হরিশ !

—ঠাকুরদা, তামাক সেজে দেবো ?

এটিও মায়ের পরামর্শ। ঐ একমাত্র উপায় ঠাকুবদাদাকে অন্যমনস্ক রাখবার। আমাদের বল্লেন—বোস আমার কাছে—

আমি, আমার ছোট ভাই নিলু, ফুচু ও দুই বোন সবলা আব বিন্নু ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি।

—সবাই এয়েচে!

—হুঁ।

—বিন্নু এয়েচে? আমাব কাছে এগিয়ে এসে বোসো সব। শোনো, সুঁদব-বনে একশো ছাপ্পান্ন নম্বব লাটে আমাব মনিবেব কাছাবী ছিল। পাইকপাড়াব রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। মস্ত বড় জমিদাব। আমি সেখানে থাকতাম. সে কাছাবীর নাম ছিল গবাণহাটির কাছারী। সুঁদবী আব গরাণ কাঠের জঙ্গল কি না? তাই নাম ছিল গবাণহাটি। একবাব নোনাতলার খালে আমাদেব ডিঙি লেগেছে, মাঘ মাসেব দিন, জলে সোন নেমেচে—

—সে কি ঠাকুবদা?

—সোন মানে জোয়াব, বে-সোন মানে ভাঁটা -বে-সোনে নৌকা চলে না সামনে, নোঙব কবতে হয ও-দিকির গাঙে। তাব পর—কি বলছিলাম?···

ওই হোল মুস্কিল। ঠাকুবদাদাব কাছে গল্প শুনবাব সুখ নেই, কেবল ভুলে যাবেন!

—বলছিলেন সোন নেমেচে জলে—

—হ্যাঁ, তার পর দেখি এক মস্ত বাঘ জলে ডিঙির পাশে জল খাচ্চে। আমাদের সঙ্গে উজিবালি বিশ্বেস ছিল বড শিকারী, সে অমনি বন্দুকের চোঙ বাগিয়ে এক ফ্যাওড় করলে। এক ফ্যাওড়, দু' ফ্যাওড়, বাস্, বাঘ উলটে পড়লো খালের জলে—হ্যাঁ মনু?

—কি ?

—তোর বাবা এলো ?

—না, এখনো আসেননি।

—গিয়ে দেখে এসো দাদাভাই আমার। অ হরিশ !

—আসেননি বাবা। গল্প বলুন ঠাকুরদা—

—দেখে এসো না দাদাভাই—

—দেখতে হবে না, আসেননি। এলে আপনার সঙ্গে কথা বলতেন না ?

ঠাকুরদা আবার গল্প বলতে সুরু করলেন। বাঘের গল্প জমাতে পারলেন না, কেবল ভুলে যান, আবার গোড়া থেকে সুরু করেন। উল্টো-পালটা করে ফেলেন, কখনো বলেন শিকারীর নাম উজিরালি বিশ্বেস, কখনো বলেন তার নাম আজিমুদ্দি বিশ্বেস।

এমন সময়ে মা ভাত নিয়ে এলেন।

আমরা বললাম—ঠাকুরদাদা, ভাত এনেচে মা—

—ও, এসো বৌমা। কি রাঁধলে ?

— মাছের ঝোল আর চচ্চড়ি।

—হরিশ আসেনি বৌমা ?

—না।

—এখনো এলো না ? রাত তো অনেক হয়েছে—

—রাত বেশি হয়নি। আপনি খেতে বসুন—আমি দুধ আনি—

—হরিশ এলে বোলো আমার সঙ্গে দেখা করে—

মা চলে গেলেন, ঠাকুরদাদার সামনে দাঁড়ালে ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হবে। ঠাকুরদাদা খাওয়া শেষ করে কিন্তু অন্য দিনের মত শুতে গেলেন না, ঠায় অনেক রাত পর্য্যন্ত রোয়াকে বসে রইলেন,

আর কেবল মাঝে মাঝে যার-তার পায়ের শব্দ শুনে বাবার নাম ধরে ডাকতে সুরু করলেন।

অনেক রাত্রে মা বললেন—বাবা, আপনি এবার শুয়ে পড়ুন, ফুচুকে পাঠিয়ে দিই, আপনাকে শুইয়ে আসুক—

—হরিশ এয়েচে?

—না।

—কেন এলো না এখনো?

—আপনার কিছু মনে থাকে না। তিনি গোয়াড়ি গিয়েচেন মনে নেই? বুধবারে আসবেন আপনাকে বলে গেলেন যে। শুয়ে পড়ুন।

ঠাকুরদাদা বসে কি ভাবলেন। কথার উত্তর দিলেন না। হয়তো মনে পড়লো বাবার গোয়াড়ি যাওয়ার কথা। ফুচু গিয়ে তাঁকে শুইয়ে দিয়ে এলো। অনেক বাতে উঠে শুনলাম, ঠাকুরদাদার ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসচে। মা শুনে বললেন—দেখে আয় কি হোলো—

গিয়ে দেখি ঠাকুরদাদা বিছানার ওপর উঠে বসে কোণের দিকে হাত বাড়িয়ে লাঠি হাতড়াচ্ছেন। তিনি না কি এখুনি বাবার সন্ধানে বেরুবেন। বাবা কেন আসেননি এখনো। তিনি মোটেই ঘুমুতে পাবেননি না কি! আমরা জানি, এ কথা ঠিক নয়। ঠাকুরদাদা বসে বসে ঢুলে পড়েন, তিনি না ঘুমিয়ে আছেন এত রাত পর্য্যন্ত! ইস্! তা আর জানি নে!

ঠাকুবদাদাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম। অবশেষে মা গিয়ে কড়া সুরে বললেন—আচ্ছা, বাবা, আপনার কাণ্ডখানা কি শুনি? ওরা ছেলেমানুষ, ওদের ঘুমুতে দেবেন না একটু?—একশো বার আপনাকে বলা হচ্ছে তিনি গোয়াড়ি গিয়েচেন, বুধবারে আসবেন, আপনি কিছুতেই

তা শুনবেন না! রাত দুপুরে উঠে বাধিয়ে দিয়েচেন গোলমাল। ওরকম করলে থাকুন আপনি সংসারে, আমি এক দিকে বেরুই—

মাকে ঠাকুরদাদা ভয় করতেন। মা ঘরে পা দিতেই তিনি বেশ নরম হয়ে এসেছিলেন, সুড় সুড় করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে আমায় কাছে ডাকলেন—শোন মনু—

—কি?

—দাদাভাই, দাদু আমার, একটা পয়সা দেবো অখন—

ঠাকুরদাদা নিঃস্ব নিষ্কপর্দ্দক লোক, তিনি পয়সা দেবেন এ কথা যদিও আমি বিশ্বাস করি নে, তবুও বলি—কি বলচেন?

—তোর বাবার চিঠি এসেচে?

—না।

—আজ কি বার?

—সোমবার।

—হরিশ কবে আসবে?

—বুধবারে।

—আচ্ছা যা—

বুধবারে বাবা কি জন্যে যেন এলেন না, কি জানি। ঠাকুরদাদা সারা দিন রোয়াকে বসে রইলেন, গম্ভীর মুখে তামাক খান আর মাঝে মাঝে বলেন—কে এলো? অ হরিশ? কিসের পায়ের শব্দ রে, ও ফুচু, ও নিলু—

ফুচু বললে—আমাদের রাঙী গাইয়ের বক্‌না, ঠাকুরদা।

—ও।

এই রকম চললো সারা দিন। রাত্রে খাবার সময় খেতে বসেচেন, আর মাঝে মাঝে কান খাড়া করে রেলগাড়ীর শব্দ শুনবার চেষ্টা করচেন;

মুখে কিছু বলেন না। হঠাৎ বড় গম্ভীর হয়ে গিয়েচেন। আমি তামাক সেজে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠে বললেন—কে?

—আমি মন্টু।

—ন'টার গাড়ী গিয়েচে জানিস?

—এখনো যায়নি। আপনি শুয়ে পড়ুন—

—শব্দ পাসনি গাড়ীর?

—না।

—ও!

বাবার কথা মুখেও আনলেন না। বললেন—পান ছেঁচে এনেচিস্? নিয়ে আয়—

বাবা তার পর দিনও এলেন না। ঠাকুরদাদা কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের গম্ভীর হয়ে গিয়েচেন। আর কিছু জিগ্যেস করেন না বা বাবার নাম ধরে ডাকেনও না।

শুক্রবার দিন সন্ধ্যের গাড়ীতে বাবা বাড়ী এলেন। ঠাকুরদাদা অভিমানে কথাই বলেন না। বাবা বুঝতে পারলেন। মাকে বললেন—বাবার দেখচি রাগ হয়েচে—যাই দেখি কি ব্যাপার—

ঠাকুরদাদা তামাক খাচ্চেন, বাবা গিয়ে বললেন—বাবা—

পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

ঠাকুরদাদার মুখে কথা নেই।

—বাবা, কেমন আছেন?

ঠাকুরদাদা নিরুত্তর।

—বাবা রাগ করেচেন না কি? তা আমি আবার রাণাঘাট যাচ্চি কাল সকাল বেলা—

—রাগ হয় না?

এবার ঠাকুরদাদা আর কথা না বলে থাকতে পারলেন না। কেন না, ওই যে বাবা বললেন, কাল সকালেই রাণাঘাট যাবেন, ওতেই ঠাকুর-দ'দার রাগ জল হয়ে গিয়েচে একেবারে।

বাবা হেসে বললেন—আপনি রাগ করতে পারেন, তবে আমি পরের কাজ করি। কাজ সারতে গেলে দু'-এক দিন দেরি হয়েই যায়—

—আমার জন্যি কি আনলি?

—ভালো জিনিষ এনেচি। আপনার ভালো লাগবে। কেষ্টনগরের সরভাজা—

—তা দিতে বল্ বৌমাকে—

সে সময় মা কালীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলেন। আসতে দেরি হোল, ঠাকুরদাদা অধীর ভাবে বার বার আমাকে বলতে লাগলেন—এলো তোর মা, ও মনু?

বাবা চলে গিয়েচেন নটবর বাঁড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে পাশা খেলতে। ঠাকুরদাদা আমাদেরই বার বার জিগ্যেস করতে লাগলেন—যা না তোর মার কাছে?

ঠাকুরদাদার উদ্বেগের ন্যায্য কারণ যে ছিল না তা নয়। মা ঠাকুর-দাদাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না গোড়া থেকেই। তাঁর জন্যে খাবার এলে, বাবা দাঁড়িয়ে থেকে না দিলে ঠাকুরদাদার ভাগ্যে অনেক সময় শূন্যের অঙ্ক লেখা হোত—এ আমি জানি। মা বলতেন—ছেলে-পিলেরা খাবে আগে তা নয় বাহাত্তুরে বুড়ো খোকন্কে আগে খাওয়াও···অত আমার শ্বশুরভক্তি নেই···উনি আমার কি করেচেন কোন্ কালে? কখনো একখানা কাপড় দিয়েচেন পুজোর সময়···ওঁর হাতে যখন পয়সা ছিল, যখন পাইকপাড়ায় কাজ করতেন? আমিও আজ আসিনি এ সংসারে, আমারও হয়ে গেল ত্রিশ বছর। আজই না হয় ভীমরতি

হয়েচে, কোন্ কালে উনি ভালো ছিলেন? ওই ছেলে আর ছেলে! আর সব যেন বানের জলে ভেসে এসেছিলাম—

একটা নাড়ু কিংবা এতটুকু আমসত্ব ছেঁড়া পড়তো ঠাকুরা....র ভাগ্যে।

বাবা নিজেব হাতে খাবার নিয়ে ঠাকুরদাদাকে দিতেন বোধ হয় এই জন্যেই। আগে ঠাকুরদাদাকে না খাওয়ালে বাবার যেন তৃপ্তি হোত না।

আষাঢ় মাসে ঠাকুরদাদা জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আর উঠতে পারেন না। বাবা তাঁকে বিছানা থেকে উঠিয়ে মুখ ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে ওষুধ খাইয়ে দেন। বেদানার রস করে মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়ান। কাছারি থেকে আসবার পথে ঠাকুরদাদার ঘরে কিছুক্ষণ বসে তবে এসে স্নানাহার করেন। কি উদ্বেগ তাঁর ঠাকুরদাদার অসুখের জন্যে।

মাকে বলতেন—বাবার জ্বব কত? দেখেছিলে? উনি তো ভুলে যান, ওষুধ ঠিকমত দেবে।

সেরে উঠেও ঠাকুবদাদা প্রায় দু'মাস বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেন না। বাবা আজ ছাগলের দুধ, কাল কুমড়োর মেঠাই, পরশু আমলকির মোরব্বা—যে যা বলে তাই যোগাড় করে নিয়ে এসে খাওয়ান ঠাকুরদাদা গায়ে বল পাবেন বলে।

ঠাকুবদাদাও হয়ে গেলেন একেবাবে বালক। তাঁর উৎপাতের জ্বালায় বাড়িসুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কেবল দিন-রাত খাই-খাই আর একে ডাকচেন, তাকে ডাকচেন। আমরা পারত পক্ষে কোন দিনই কেউ ঠাকুবদাদার ঘেঁস বড় একটা নিই নে, এখন তো একেবারে ত্রিসীমানায় ঘেঁসি নে। দশ ডাক দিলে একবার উত্তর

দিই কি না দিই। মা ভাতের থালা দিয়ে আসেন, নিয়ে আসেন এই পর্য্যন্ত।

কথার জবাব দিলেও খুব হৃষ্টচিত্তে দেন না। যা দেন, তাও আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অথচ সেই মা-ই নদীর ঘাটে বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে হাবড়হাটি বকেন।

ঠাকুরদাদা অসহায় শিশুর মত বাবার পথ চেয়ে বসে থাকেন। বাবার পায়ের শব্দ পেলেই সুর ধরেন অ হরিশ, এলি, অ হরিশ!

আর ঠিক কি বাবার পায়ের শব্দ চেনেন ঠাকুরদাদা!

বাবা এসে নিজে দেখা শুনো করবেন, নাওয়াবেন, খাওয়াবেন ঠাকুরদাদাকে।

বাবা এলেই ঠাকুরদাদা যত কিছু অভিযোগ সুরু করে দেবেন তাঁর কাছে ছেলে মানুষের মত। বৌমা আমাকে এ করেনি, আমাকে তা দেয়নি। তাতে ঠাকুরদাদা মায়ের সহানুভূতি আরও হারাতেন।

বাবা তা জানতেনও। সে জন্যে নিজে সর্ব্বদা খবরদারি করতেন।

কারো হাতে ঠাকুরদাদাকে ছেড়ে দিয়ে বাবার বিশ্বাস হোত না, দিদি ছাড়া। দিদি তো শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েচে।

পৌষ মাসে বাবা আবাদে গেলেন পৌষ কিস্তির খাজনা আদায় করতে। বার বার মাকে বলে গেলেন ঠাকুরদাদার যেন অযত্ন না হয়।

মা বল্লেন—কেন, আমি কি-বুড়োকে গলা টিপে মেরে ফেলবো না কি?

—ছিঃ, অমন বলতে নেই—

—না, তুমি সেই রকম কথাবার্ত্তা বলচো কি না তাই বলচি। তবে আমার সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে সব দিক্ দেখতে তো পারি নে। যত দূর পারি, চিরকাল যা হয়ে আসচে, তাই হবে।

—একটু মন দিয়ে—মানে উনি বুড়ো মানুষ—

—আমি তা জানি। যা পারি হবে। ভেবো না।

বাবা ঠাকুরদাদার কাছে বিদায় নেবার সময় কত দিন দেরী হবে তা ঠিক বল্লেন না। বল্লে ঠাকুরদাদা হয়তো যেতে দেবেন না কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। বাবা যখন বেরুলেন, ঠাকুরদাদা বল্লেন—অ হরিশ, কবে ফিরবি ?

তাঁর চিরন্তন প্রশ্ন।

—এই যত শীগ্‌গির হয় বাবা, আপনি ভাববেন না।

ঠাকুবদাদাকে ফেলে কোথাও গিয়ে বাবা স্বস্তি পেতেন না আমি জানি। ঠাকুরদাদা না কি তিন বছর বয়স থেকে বাবা ও মার মত করে মানুষ করেন বাবাকে ঠাকুরমায়ের মৃত্যুর পরে। বাবা যেন ভাবতেন ঠাকুবদাদা শত্রুপুবীর মধ্যে বাস করচেন চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত অবস্থায়—একমাত্র আপনার জন তিনি নিজে। চোখে চোখে রাখতেন এই জন্যে সর্ব্বদা। কারো হাতে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করতে পারতেন না। বলা বাহুল্য, ঠাকুবদাদা তো নিজেকে অসহায় শত্রুবেষ্টিত বলে মনে করতেনই।

বাবা এবার বাড়ি ফিরতে বড় দেরি করতে লাগলেন।

অবশেষে যখন ফিরলেন তখন গরুর গাড়ি করে ভীষণ অসুস্থ অবস্থায়। ঘোর জ্বর। জ্বরের ঘোরে বলতে লাগলেন—বাবাকে কেউ বোলো না, আমি অসুখ হয়ে বাড়ী এসেচি—

ঠাকুরদাদা কিন্তু আন্দাজে মাঝে মাঝে বাবাকে ডাক দিতেন। বুঝতে পেরেছিলেন কি না কি জানি।

অ হরিশ! আমার জন্যি কি আনলি অ হরিশ?

বাবা ঠিক শুনতে পান। জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বলেন—বাবা বাঁচতে আমার যেন কিছু না হয় হে ভগবান। মরে সুখ পাবো না—

অসুখ বড় বাড়লো। জেলা থেকে ডাক্তার এসে দেখলে দু'দিন। সংসারের পুঁজি ভেঙ্গে বাবার চিকিৎসা হোল।

এক দিন বড় বাড়াবাড়ি হোল। ঠাকুরদাদাকে আর দেখা শুনো করার লোক নেই। বাবাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। গ্রামের ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ঠাকুরদাদার কাছে বসে তাঁকে বাজে গল্পে ভুলিয়ে রাখলে।

সবাই বলতে লাগলো—সুবোধ আর বাঁচবে না। আহা, বুড়োর কি কপাল !

বাবার মৃত্যু হোল শেষ রাত্রে।

ঠাকুরদাদা তার কিছুই জানেন না। গভীর ঘুমে অচেতন।

খুব ভোরে বাড়িতে এসে ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ঠাকুরদাদার হাত ধরে ছুতো করে বাইরে কোথায় নিয়ে গেল।

—চলুন জ্যাঠামশাই, একটু বড়দার বাড়িতে। আপনাকে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে সেখানে। তারা বলেচে—

আমি যাবো ?

কান্না-কাটির চাপা শব্দে বলতে লাগলেন—কি রে ? অ হরিশ, কি রে ? কিসের শব্দ ?

সন্ধ্যায় আমরা বাড়ী এলে ঠাকুরদাদাকে ঘিরে বসি। হঠাৎ আমার বড় মমতা হোল ঠাকুরদাদার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে।

নতুন যেমন একটা মমতা। যা এত দিন মনের মধ্যে খুঁজেও পাইনি।

বাসা

খড়গপুরে সভা করতে গিয়েছিলাম। বৈশাখ মাস, বৃষ্টি হয়নি প্রায় সারামাস, তার ওপর খড়গপুর শহরের গরম। গাছ নেই, পালা নেই—ছোট্ট ছোট্ট রেলওয়ে কলোনির বাসাঘর, সামনে দিয়ে ড্রেন চলে গেছে, ময়লা জল ভর্তি। চার নম্বর বাসায় তবুও যা হয় লোক একরকম বাস করতে পারে, তিন নম্বর বাসায় কষ্টেসৃষ্টে চলে, কিন্তু দু'নম্বর এবং এক নম্বরের বাসা যে হতভাগ্য লোকেদেব জন্যে তৈরি হয়েচে, তারা পশুজীবন যদি যাপন করতো অরণ্যে এর চেয়ে অনেক ভালো থাকতে পারতো। ভগবানের আলো বাতাস থেকে এভাবে বঞ্চিত হোত না।

এক ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি হয়েছিলাম। তিনি কি একটা ভাল কাজ করেন, চার নম্বব বাসায় বাসেব অধিকাব তিনি পেয়েছেন। সেই নিচু নিচু ছোট ছোট ঘরে তাঁর স্ত্রী কার্পেটেব ওপর ফুল-বসানো অক্ষরে 'পতি পরম গুরু' লিখে বাঁধিয়ে রেখেছেন। ডিস পেয়ালা পুতুল মাটির ময়ুব সাজিয়ে রেখেছেন কাঁচের আলমারীতে, দেওয়ালে টাঙানো আছে সানলাইট সাবানের ক্যালেণ্ডার এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি, রাসলীলা ও চৈতন্যদেবেব সংকীর্তনের ছবি, কোথাকার মজুরেরা এক বিদায় অভিনন্দন দিয়েছিল বাড়ির কর্তাকে, সেখানা বাঁধিয়ে টাঙানো ইত্যাদি। হাওয়া আসে সামান্য, বৈশাখের উত্তাপে নিচু কংক্রিটের ছাদ আগুনের খাপরার মত গরম হয়েচে, হাত-পা

নাড়ার স্থান নেই বাসার মধ্যে, গরমে হাঁপ ধরে যায়। চোখের দৃষ্টি সর্বদা দেওয়ালে বেধে যাচ্চে।

আমি বল্লাম—কি করে থাকেন এখানে?

গৃহস্বামী বল্লেন—কি করি বলুন। চাকরী।

—কত বছর আছেন?

—১৯২৭ সালে জয়েন করেছি। তাহোলে হিসেব করুন। এই একুশ বছর চলচে।

—বরাবর এই বাসায়?

—তাহোলে তো বাঁচতাম। মাইনে যখন কম ছিল, তিন নম্বর বাসায় ছিলাম ন'বছর। তু'নম্বর বাসা আপনি যদি দেখতেন, তবে না-জানি কি বলতেন! সেই তু নম্বর বাসায় ছিলাম এক বছর।

আমি মনে মনে কল্পনা করলুম সামান্য তুশো টাকার জন্যে এই ভদ্রলোক কত জ্যোৎস্নাময়ী তুপুর রাত্রির রহস্য, কত বর্ষার ঝর ঝর ছন্দ, কত সজনে-ফুলফোটা কোকিল ডাকা ফাল্গুন দিন, কত মধুর অপরাহ্ণ হারিয়েছেন, শুধু ইনি যে একা হারিয়েচেন তা নয়, এঁর বাড়ির ছেলে-মেয়েরা হারিয়েচে তাঁদের জীবনের অতি রহস্যময় বাল্যদিনগুলির পরম পবিত্র মুহূর্ত, হারিয়েচেন এঁর স্ত্রী। তার চেয়েও কষ্ট এই যে, এঁরা জানেন না যে এঁরা কি হারিয়েছেন—সেই কি যেন একটা জিনিসের বিজ্ঞাপনে যেমন ছবির নিচে লেখা আছে। বল্লাম—ছুটি পেয়ে দেশে যান ক'বার?

—ক'বার? মাত্র তুবার দেশে গিয়েছি এই বাইশ বছরের মধ্যে।

আপনা আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল—বড় কষ্ট আপনাদের।

তিনি তখুনি বল্লেন—না, এর চেয়েও কষ্ট তাদের, যারা নতুন আসে।

বাসা পেতে আগে লাগতো সাত আট বছর, এখন লাগে তেরো চোদ্দ বছর।

—কোথায় থেকে চাকরী করবে সে বেচারী ?

—গাছতলায়। তা কোম্পানী কি জানে ? চাকরী করতে হয় কারো। বাসার খবর কোম্পানী রাখে না। অথচ এই খড়গপুর শহরে কোনো বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। কেন না এখানে বাইবের কোন লোকের ঘর নেই, সবই রেলের কোয়ার্টার।

—সত্যি এ ব্যাপার ?

—খুব সত্যি।

—তারা থাকে কোথায় ?

—ওই হয়তো আপনার একখানা বাইরের ঘর আছে, সেখানে একটু জায়গা দিলেন। নয়তো কোন অবিবাহিত লোকেব কোয়ার্টারে রইল। অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টাবে খুব ভিড় হয়। নতুন-চাকুরে-অবিবাহিত যুবকেরা হার্ড টুগেদার। ভেড়ার গোয়ালেরও অধম। নিয়ে যাবো আপনাকে তেমনি এক বাসায়।

আর একজন কে বল্লেন—আর একবার আপনাকে নিয়ে যাবো এক নম্বর দু নম্বরে। দেখবেন সে কি জিনিস। মানুষের বাস করবার জন্যে সেগুলো তৈরি হয়নি। কোন্ এনজিনিয়ার যে সেগুলো তৈরি করেছিল, তার কি নিজের বাড়িতে স্ত্রী পুত্র ছিল না—এসব কথার উত্তর ভগবানই দিতে পারেন।

সেই আর একজন ভদ্রলোক বল্লেন—আপনাকে নিয়ে যেতে হবে আর এক জায়গায়। শহরের দক্ষিণে। সেখানে যতসব অফিসারদের কোয়ার্টারস। দেখে অবাক হয়ে যাবেন। স্বর্গ।

গৃহস্বামী বল্লেন—হ্যাঁ হে মিত্তির, সেখানেও একবার নিয়ে যেও তো এঁকে!

পূর্বের ভদ্রলোকটি বল্লেন—না নিয়ে গেলে কনট্রাস্টটা তৈরি হবে না যে! উনি বুঝবেন কি করে, যে আমরা কোন নরকে, আর তারা কোন স্বর্গে! বোধহয় মিঃ বাসুর ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে। যেতেই হবে। খবর দেবে এখুনি।

—স্বর্গই বটে। শহরের দক্ষিণে। খোলা জায়গায়। গিয়ে দেখবেন কি চমৎকার হাওয়া। কি সবুজ লন্। ফুল, অর্নামেণ্টাল ট্রি্জ, বড় বড় কাঁচের সাসি-খড়খড়িওয়ালা জানালা দরজা—লাইট, ফ্যান সেসব অন্য ব্যাপার। আসল কথা সেসব তো আপনার আমার জন্যে তৈরি নয়, সে ছিল সাহেবদের জন্যে। সাদা চামড়া গায়ে থাকলেই অফিসার্স কোয়ার্টার্সে তার জায়গা। কি বড় কি ছোট। কোন সাহেব কখনো তিন নম্বর চার নম্বরে থাকতো না—দু' নম্বর এক নম্বর তো দূরের কথা। কি করে শোষণ করেচে দেশটা! আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনি।

বেলা গেল।

পয়লা বৈশাখের উৎসব সভা এবং সেই সঙ্গে 'বিচিত্রানুষ্ঠান' বলে একটা কথা সব জায়গায় বড্ড চলেচে—সেই 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

যথারীতি সবই ছিল। সভাপতি নির্বাচন, উদ্বোধন সঙ্গীত, মাঝে মাঝে বিকল হওয়া মাইক. রবীন্দ্র-সঙ্গীত (ভুল সুরে), আধুনিক কাব্য-সঙ্গীত (কোন প্রকার সুর নেই তাতে), বক্তৃতা, তারপরে আবার 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

সর্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ দিতে যখন উঠলাম, তখন রাত দশটা। লোক জড়ো হয়েছে বহু, কয়েক হাজার হবে। বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে কেউ দাঁড়াতো না সভাপতির অভিভাষণ শুনবার জন্যে—কিন্তু

সভার উদ্যোক্তারা ভারি চালাক, তাঁরা সবশেষে রেখেছিলেন একটি অতি লোভনীয় ব্যাপার এবং সেটা বড় বড় অক্ষরে কার্যসূচীতে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন, সেটি হোল 'জলযোগ'। অর্থাৎ দালদায় ভাজা বুঁদে আর দরবেশ মিঠাই, ব্যস! শালপাতার ঠোঙায় ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকদল সকলের পেছনের সারির ছেলেমেয়ের মধ্যে বিলুতে শুরু করে দিয়েছে।

দু'একজন চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—বড্ড গোলমাল হচ্চে! দেওয়া বন্ধ করো এখন—দেওয়া বন্ধ করো—

আর দেওয়া বন্ধ করো! ঐজন্যেই আসা। আর ঐ 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর জন্যে।

কে এসেচে সভাপতির বাজে ভ্যাজ ভ্যাজ শুনতে?

দু একবার হাততালি পড়লো। কিন্তু পিছনের ছেলেমেয়ের সারি 'জলযোগের'-এর ঠোঙার জন্যে অধীর হয়ে উঠেচে। সংক্ষেপে সেরে বসে পড়লাম।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়াও শেষ হয়ে গেল।

একজন ভদ্রলোক এসে বল্লেন—চলুন, একটু জলযোগ হেঁ হেঁ—এই পথে—আজ্ঞে—

না। আয়োজন বেশ ভালোই। নিন্দে করবার কিছু নেই। খুব ভাল আয়োজন।

বেরিয়ে আসচি, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কে একটি ছোকরা এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মুখ তুলতেই দেখলাম সে আমাদের গ্রামের হীরু জেলের ছেলে কানাই। কানাই ম্যাট্রিক পাশ করে আগে পূর্ববঙ্গে কোথায় যেন রেলে চাকরী করতো।

বল্লাম—এখানে কাজ কর না কি ?

—হ্যাঁ। পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, ঈশ্বরদি ছিলাম। আপনাকে মা ডাকচে—ওইখানে দাঁড়িয়ে—

—তোমার মা ! এখানে ?

খুব অবাক হয়ে গেলাম। কানাই জেলের মা চিবদিন পাড়ায় চিঁড়ে কুটে, ধান সিদ্ধ কবে ও মাছ বিক্রি করে সংসার চালিয়ে এসেছে। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ও বৌ সে। চিরদিন দেখে এসেছি জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কুড়ুবাব জন্য খুব ভোরে উঠে সে গ্রামেব পেছনেব বড় জঙ্গলেভর্তি আম-কাঁঠাল বাগানে আম কুড়ুবাব জন্যে যেতো এবং আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোজ তাকে দেখা যাবেই আমবাগানে গভীর কাঁটাবন ও লতাপাতার জঙ্গলেব মধ্যে ঢুকে বাহুড়ে খেকো আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষেই পল্লীগ্রামেব দেশী আম শেষ হয়ে যায়, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওকে আম কুড়ুতে দেখে আমার হাসি পেতো।

আমাব বাড়িব ওপর দিয়ে ওব আম কুড়িয়ে ফেরবার রাস্তা, পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়, এক বাড়ির উঠোন দিয়ে অপর বাড়ির লোকে যাতায়াত করে। ও যখন ফিরতো, তখন ওকে বলতাম, ও কানাইয়ের মা, কি আম কুড়ুলে ?

কানাইয়েয় মা চুপড়ি দেখিয়ে বলতো—আম আর কই দাদাঠাকুর। এই দেখুন—

প্রায়ই ঘেয়ো বাহুড়ে-খেকো আম দু একটা ছাড়া দেখতাম না। ও আবার এত ভালো, যেদিন একটাও ভাল আম পাবে, সেদিন আমাকে বলতো—এই আমটা আপনার সেবার জন্যে দিয়ে যাই। রাখুন।

আমি বলতাম—না না তুমি নিয়ে যাও—

ও শুনবে না, ঠিক দিয়েই যাবে।

গ্রামের মধ্যে সকলেই বলতো, কানাই জেলের মা বড় সৎ। কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া করেনি, মাছ বিক্রির সময় ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার ঘুঘু গিন্নীরা ধারে মাছ নিতো, ছ'মাস ঘুরিয়েও পয়সা দিতো না—অবশেষে হয়তো পয়সা মেরে দিতো। কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ওর ছিল না, আবার ধার চাইলে ছ'মাস ঘুরিয়েও যে কাল পয়সা দিয়েছে, তাকেও আজ আবার মাছ দেবে।

আমাদের পাড়ার রাম চাটুয্যের ছেলে জেলি পিতৃহীন দরিদ্র অবস্থায় কোনো রকমে নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করে রেলে কি একটা চাকরী পেয়েছিল। জেলির মা একা থাকতেন বাড়িতে, বাড়ির সামনের ডোবায় হয়তো সকালে কানাইয়ের মা বাসন মাজতে এসে দেখলে বামুন পাড়ার ঘাটে (একটা ছোট্ট ডোবার আবার তিনটে ঘাট!) জেলির মা বড়ি দেওয়ার ডাল ধুতে নেমেচেন। জেলির মা হেসে বল্লেন—ও জেলে বৌ, জেলি কাল রাত্তিরে বাড়ি এসেছে...

...ওমা, কি হবে! তাই নাকি?

অমনি সে এঁটো বাসন ফেলে ছুটে আসবে।

...কই, কোথায় গেল আমার সোনা, আমার মাণিক, আমার বাছা...

জেলিকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। যখন জেলি বাড়ি আসবে, তখন সে কি অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের পরিচয় ওর চোখেমুখে, জেলির জন্যে বড় কৈ মাছ জোগাড় করে নিয়ে আসবে, নিজের ঘরের গাইয়ের দুধ ঘটি মেপে দিয়ে যাবে, সরু চিঁড়ে কুটে সঙ্গে বেঁধে দেবে জেলির চাকুরিস্থানে চলে যাওয়ার দিন।

কত দিন এই মাতৃস্নেহের লীলা দেখে এসেছি।

সেই জেলেবৌ আজ এখানে!

কত দূরে যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে। জীবনে কখনো যে রাণাঘাটও যায়নি, সে আজ এসেচে খড়গপুর, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে, বাঁশবাগানের তলায় ওদের জেলেপাড়ার সে খড়ের ঘরখানা ছেড়ে ছেলের বাসায়!

জেলেবৌ আমায় দেখে এগিয়ে এসে একগাল হেসে বল্লে—দাদাঠাকুর আমাদের কতদূরে এসে নেকৃচার বল্‌চে! আমায় কানাই বল্লে—দাদাঠাকুরের নেকৃচার হবে আজ সভায়। আমি বলি, আমায় নিয়ে চল্, কতকাল দেখিনি তাঁকে। কি সুন্দর নেকৃচার বল্লেন আপনি।

বলে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বয়সে সে আমার চেয়ে বড়, আমার দিদির সমান। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, জেলেবৌ আরো বড় হলেও সে এমনিভাবেই আমায় প্রণাম করতো। গ্রামের নিয়ম।

বল্লাম—ভাল আছ কানাইয়ের মা?

—আপনাদের আশীর্বাদে আছি একরকম। বৌদিদি কই? ছেলেমেয়েরা সব ভাল?

—একরকম ভাল আছে। আজকাল সবাই কলকাতায়।

—দেশে যান নি?

—মধ্যে গিয়েছিলাম একবার। মাস দুই আগে।

ও অমনি আকুল ও পিপাসিত সুরে বল্লে—বলুন গাঁয়ে কে কেমন আছে?

ইতিমধ্যে সভার উদ্যোক্তাগণ আমাকে তাগিদ দিতে লাগলেন—তা হোলে কাইণ্ডলি আসুন, আবার আমাদের নববর্ষের ডিনার পার্টির আয়োজন রয়েছে মিঃ বাসুর ওখানে—

আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই সত্যি একটুও। এদের টান আমার হাজার ডিনার পার্টির চেয়েও বেশি। সমস্ত খড়গপুর শহরের হাজার সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, সুভদ্র লোকের মধ্যে এই গ্রাম্য, অশিক্ষিতা জেলেবৌ আমার অনেক আপনার জন বলে মনে হোল সেই মুহূর্তে।

জেলে-বৌ বল্লে—তা হবে না, সে কি দাদাঠাকুর? মোদের বাসায় যেতে হবে না বুঝি, না এমনি ছাড়বো? পায়ের ধুলো দেবেন না বুঝি বাসায়?

—চলো। যাবো না কেন? বাঃ—

এদিকে এরা ছাড়ে না।—সে কি স্যার? এখন গেলে আর কি ওরা না খাইয়ে ছাড়বে? যাবেন না।

আমি বল্লাম, কিছু না, বেশি দেরী হবে না। এখুনি আসচি। দেশের লোক, ধরেচে—

ওদের সঙ্গে ওদের বাসায় গেলাম। মুশ্‌কিল, দু'নম্বরের বাসা, কম মাইনের লোকের বাসা।

আমাকে ওরা নিয়ে গিয়ে বসালে। দুখানা ছোট্ট ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা বারান্দা, এই হোল দুনম্বর কোয়ার্টার্স। বৈশাখ মাসের দারুণ উত্তাপে সে ঘরের অবস্থা যে কি, তা না অনুভব করলে বুঝিয়ে বলা কঠিন। জেলখানা এর চেয়ে ভালো। নড়বার-চড়বার জায়গা নেই। আলো বাতাস আসে না, হাঁপ ধরে যায়। একখানা ঘর একটু সাজিয়ে রেখেচে, একখানা ফর্সা চাদরও পেতে রেখেছে বিছানায়। একটা সস্তা টাইমপিস ঘড়ি কিনে ছোট একটা টেবিলে রেখে দিয়েচে। ওর বাপ হীরু জেলেকে আমরা বাল্যকালে দেখেছি বাঁশের দোয়াড়ি তৈরি করে মাছ ধরতো। হাটে মাছের ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রী করতো। কানাইয়ের মা টিনের ক্যানেস্তারায় ধান সেদ্ধ করতো বাড়ির উঠোনের আমতলায়। বড় গরীব ছিল ওরা।

কানাইয়ের বৌ এসে আমাকে প্রণাম করলে। বল্লে—বসুন, একটু চা করে দেবো।

আশ্চর্য্য, এরা চা খেতে আরম্ভ করেচে এখানে এসে। কানাইয়ের মা আহ্লাদের সুরে বল্লে—কানাই একটা ঘড়ি কিনেচে দেখেচ দাদাঠাকুর?

সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটা।

আমি সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে নাড়িচাড়ি, দেখি। খুব প্রশংসা করি ঘড়ির!

বল্লাম—বাঃ বেশ টেবিল চেয়ার দেখচি যে!

—কানাই সব করেচে দাদাঠাকুর।

—দিব্যি সাজানো ঘর। ওখানা কি টাঙানো?

—বৌমার হাতে তৈরি। ঝিনুক দিয়ে তৈরি ফুল।

—বাঃ, বেশ করেচে বৌমা।

—হবে না? বেশ ভালো ঘরের মেয়ে যে! গান গাইতে জানে। দিব্যি গান, হ্যাঁ।

—গান?

—হ্যাঁ, বাজনার বাক্সো বাজিয়ে—

—হারমোনিয়াম? এটা সত্যি আশ্চর্য কথা হোল।

—শোন্‌বা গান দাদাঠাকুর? ও বৌমা, চা করে গান শুনিয়ে দাও দাদাঠাকুরকে। আজ আমার কত আনন্দের দিন। দাদাঠাকুর পায়ের মাটি ঝেড়েচেন আমার ঘরে।

—না, বড্ড খুশি হলাম কানাইয়ের মা। কানাই যে এত উন্নতি করবে সব রকমে, তা আমি জানতাম না।

কানাইয়ের মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—আশীর্বাদ

করো দাদাঠাকুর, কানাই আমার বেঁচে থাকুক, সংসারের দুবেলা দুমুঠো খেয়ে আঁচায় যেন···জানো তো, যখন তিনি মারা গেল, কি কষ্ট করে মানুষ করেচি। কানাই তখন এক বছরের বাচ্চা। কত কষ্ট করিচি ওর জন্যি। লোকের ধান সেদ্ধ করে, চিঁড়ে কুটে, বাসন মেজে তবে ওকে মানুষ করিচি। সেই কানাই আজ বিয়ে করে মোরে বাসায় এনেচে, ঘড়ি কিনেচে, কেঁদারা কিনেচে, চা খাচ্ছে—

আমি গম্ভীরভাবে বল্লাম—ঠিক ঠিক। তার আর কথা কি বলো—

এই সময় কানাই আমার জন্যে খাবার কিনে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। কানাইয়েব বৌ একটা বেকাবিতে গরম কুমড়োর ফুলুরি, রসগোল্লা ও নিমকি আমায় খেতে দিলে। বল্লে—খেয়ে দেখুন, কুমড়োর ফুলুরি এখন ভাজলাম। চা নিয়ে এলে কানাইয়ের মা বল্লে—এই পেয়ালাগুলো কানাই এবার কিনেচে। ভালো দাদাঠাকুর ?

—খুব ভালো। চমৎকার।

কানাই সলজ্জ সুরে মাকে বল্লে—তুমি যাও ওদিকে, পান নিয়ে এসো কাকাবাবুর জন্যে।

সে বেচারী জানে না, তার মা আগে কি বলেচে। বা এখন আরো কি বলবে।

কানাইয়ের মা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

ওর বৌমাকে নিয়ে এসে হাজির করলে গান শুনতে। হারমোনিয়াম নিয়ে এল।

বল্লাম—এ হারমোনিয়াম কি কানাই কিনেচে নাকি ?

কানাইয়ের মা বল্লে—না দাদাঠাকুর। বৌমা গান করে ব'লে পাশের বাসা থেকে আনা।

গান গাইলে কানাইয়ের বৌ। মন্দ নয়, বেশ গান।

আসবার সময় কানাইয়ের মা বল্লে—কেমন গান গায় আমার বৌমা ?

—ভারী চমৎকার। অতি সুন্দর গান।

কানাই বল্লে—তুমি যাও দিকি মা—ওদিকে যাও। কাকাবাবুর দেরী হয়ে যাচ্চে। আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কানাইয়েব মা আমার সঙ্গে গলিব মোড় পর্যন্ত এল।

সে বড্ড খুশি যে, আমি তাদের বাসায় এসেচি বা এখানে চা-খাবার খেয়েছি।

আমাদের গ্রামে বসে কখনো এ ব্যাপার সম্ভব হতো না।

আরও খুসি এই যে, কানাই আজ এত বড় হয়েছে, এত উন্নতি করেছে।

বার বার আমায় বলতে লাগলো—যদি গাঁয়ে যান দাদাঠাকুর, মোদের কথা বলবেন সবাইকে। আমি কতকাল গাঁয়ে যাই নি। সেই আর বছর আষাঢ় মাসে বাসায় এইচি এক বছব হত্তি চললো—বড্ড মনে পড়ে গাঁয়ের কথা—মোদের উঠোনেব গাছটার অতগুলো পেয়ারা, এবার কে খাবে, কি জানি ?

এর পরে মিঃ বাসুর ডিনার পার্টিতে খুব জঁাকজমকের ভোজ ও আদর আপ্যায়নের ব্যাপার। চপ, কাটলেট, পায়েস, ক্ষীর, আম, সন্দেশের ছড়াছড়ি। সত্যি চমৎকার খাওয়া। অফিসাবদের অঞ্চলের বড় বাংলো। টেনিসের সবুজ লন। ভারবিনা ও জিনিয়ার সারি। এরিস্টলোকিয়া লতায় ঝুমকো ফুল গেটে দুলচে। মিঃ বাসুর মেয়ে কল্যাণী, নীলিমা এসরাজ বাজিয়ে আমাদের শোনালে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে, ছোট্ট মেয়ে রেণু একটা ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করলে।

তারপর দুই বোনে মিলে রামধুন গাইলে অতি সুন্দর। দুই বোনই শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশুনো করে। দেখতেও সুন্দরী।

খেতে বসে কতবার মনে হোল কানাইয়ের মার বাসায় সেই সস্তা টাইমপিস্ ঘড়িটাতে ক'টা বাজলো দেখে আসি।

বন্দী

অনেকদিন পবে দেশে ফিরেছি মাত্র দিন পাঁচ ছয়েব জন্যে। বাড়ীতে চাবি দেওয়া আছে আজ বছর খানেক। স্ত্রীপুত্র ঘাটশিলার বাড়ীতে গিয়েছে অনেকদিন। বর্ষাকালে আর নিয়ে আসবো না।

বাজাবে একটি লাইব্রেরি কবেছে ছেলেবা। বিকেলে সেখানে তারা আমায় নিয়ে গেল। সেখানে বসে ওদেব সঙ্গে গল্প কবচি, এমন সময় বাইবে থেকে কে বল্লে, আপনাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন—বাইবে এসে দেখি একটি যুবক বেঞ্চির ওপব বসে আছে, আমায় দেখে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে উঠলো। বল্লাম, বসুন-বসুন, নমস্কার। কোথা থেকে আসচেন?

যুবকেব বেশের দিয়ে চেয়ে আমার একটু অদ্ভুত লাগলো। লম্বা প্যাণ্ট ও হাফ সার্ট পরা, গলায় দুটো টাই একসঙ্গে বাঁধা। পায়ে দামী চামড়ার জুতো, তবে বর্ষার জলে কাদায় বিবর্ণ। চোখে

চশমা, কব্জিতে হাত-ঘড়ি। আমায় 'যুক্ত করে' নমস্কার ক'রে বল্লে, চিনতে পারছেন না?

—না।

—কেন সেই বাগেরহাটে?

বাগেরহাটে দু'বছর আগে একটা সভায় গিয়েছিলাম বটে, কতলোকের সঙ্গেই সেখানে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে কোন একজনকে মনে করে রাখার মত আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তি আমার নেই। তবুও মিথ্যে কথা বলতে হলো বাধ্য হয়ে। এত আশার দৃষ্টি যুবকের চোখে, কেমন মায়া হোল। বল্লাম, ও! এবার মনে পড়েচে বটে। না চিনতে পারার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে গিয়ে বল্লাম, আপনার চেহারা একটু খারাপ হয়ে গিয়েচে—

এমন কেউ নেই যে ভাবে না তার স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে ভাল যাচ্ছে না। যুবকটি তখনি বল্লে, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হচ্চে এদেশে এসে।

—ও।

—বড় মনের কষ্টে আছি।

—ও।

—আপনার কাছে এলাম—

বলে একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলো। আমি চুপ করে বসে রইলাম, কোন্ দিকে ওর কথাবার্ত্তার গতি বুঝতে না পেরে।

ও আবার বল্লে, আপনি যদি একটু—মানে—

আর একবার লাজুক হাসি হেসে ও চুপ করলো।

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, কোন্ সাহায্যের ইঙ্গিত করচে বক্তা। আর্থিক সাহায্য নিশ্চয়ই নয়, বেশভূষা দেখেই সেটা বেশ

বোঝা যায়। অন্য কি ধরণের সাহায্য হতে পারে? খুলেও তো কিছু বলে না।

বল্লাম, আপনি এখানে আছেন কোথায়?

—চালতেপোতা গ্রামে। বড় কষ্টে আছি। আই এ্যাম অলমোষ্ট এ প্রিজনার ইন্ মাই ওন হোম—

—কেন, কেন?

—পয়সা হাতে নেই বুঝলেন না? একটুখানি রাণাঘাটে যদি যেতে হয় তাও পরের হাত-তোলা পয়সার ওপর ডিপেণ্ড্ করতে হয়। আই ফিল্ লাইক এ হাফ-ড্রাউনড্ ম্যান—কলকাতা তো বহুদূর। কে অত পয়সা ভাড়া দেবে?

—ও।

আর কি বলি 'ও' ছাড়া? ব্যাপারটার চারিপাশে এখনো বেশ ঘনীভূত কুয়াসা। কেনই বা নিজের বাড়ীতে নিজে বন্দী। কেনই বা কোনো চেষ্টা করে না অর্থ উপার্জ্জনের, বাধা দিচ্ছেই বা কে? ব্যক্তিগত সংবাদ বেশী জিজ্ঞাসা করার দরকারই বা কি আমার।

তারপর ও আপনিই বল্লে, বড্ড কষ্ট হচ্ছে এখানে। কখনো পাড়াগাঁয়ে থাকিনি। একটা মানুষ নেই যার সঙ্গে মিশি। আজ আপনি এসেছেন শুনে চালতেপোতা থেকে হেঁটে এলাম।

—হেঁটে এলেন? সে যে খাঁটি ছ'মাইল রাস্তা।

—বেশী হবে। প্রায় সাত মাইল। তবে একটা সোজা রাস্তা আছে মেহেরপুর রেল ফটকের পাশ দিয়ে মাঠের মাঝখান বেয়ে। এখন বর্ষায় সে পথে বেজায় কাদা।

—আপনার বড্ড কষ্ট হয়েছে—

—এ আর কিসের কষ্ট? আসল কষ্ট পাচ্ছি গাঁয়ে বসে। একটা

কালচার্ড লোক নেই। না বোঝে সাহিত্য, না বোঝে কোনো কিছু। জানেন, পিকাসো বলে যে একজন শিল্পী আছে, তাই তারা কোনো দিন শোনে নি।

—সেটা অপরাধ নয়। আমাদের শিক্ষিত সমাজে বা ক'জন জানে পিকাসোর নাম?

—যাই বলুন আমার শিক্ষা একটু অন্য রকম। আমি ভালবাসি কালচার। ভালবাসি আর্ট। যখন ইউনিভার্সিটিতে এম এ. পড়তাম, সে সময় একবার লাইব্রেরিয়ানের কাছে সেগান্ সম্বন্ধে বই চাইতেই তিনি—

—আপনি এম. এ. পাশ?

যুবক পুনরায় অপ্রতিভের হাসি হেসে চুপ করলে একটু খানির জন্যে। বল্লে, পাশ করিনি। এক বছর পড়েছিলাম—ওঃ—নাইনটিন থার্টি নাইন টু নাইনটিন ফর্টি টু এই তিন চার বছর—আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক'টি বছব কেটেচে! বলে সে খানিকক্ষণ স্বপ্নাতুর আকুল দৃষ্টিতে জানালার বাইরে গিরিন ঘোষের ধানের আড়তের দিকে চেয়ে রইল।

তারপরে বল্লে, জানেন, আমি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখে ষ্টেট্সম্যানে পাঠিয়েছিলাম। ফেরৎ পাঠিয়েছে। নেয় না। ইংরেজি কবিতাও লিখে থাকি। শুনবেন?

—বেশ, বেশ। বলুন না।

—আচ্ছা, একটু পরে বল্‌ব। এখন এদের সামনে কি বলি বলুন। একখানা উপন্যাস লিখেছি—দু' ভলুমে শেষ হচ্চে। প্রায় ন'শো পাতা। আপনাকে একদিন শোনাতে চাই।

—বেশ। একদিন নিয়ে আসুন না? তবে এই হপ্তার মধ্যে। নয় তো আবার চলে যাবো।

—কালই নিয়ে আসবো। আর ছোট গল্পও লিখেছি চার পাঁচটা। সেগুলো যদি কোনো কাগজে বের করে দেন—

—আপনি পাঠিয়ে দিন কোনো ভালো মাসিক পত্রিকার ঠিকানায়। তাদের ভাল লাগে, ছাপবে।

—ওরা নেয় না। ভালো গল্প পাঠিয়ে দেখেচি, পড়েও দেখে না। ফেরৎ দেয়। সেজন্যেই তো আপনার কাছে আসা। যদি একটু সাহায্য করেন—আসল কথা কি জানেন, আই অ্যাম্ এ প্রিজনার ইন্ মাই ওন্ হোম—ছুটো টাকা চাই, রাণাঘাটে যাবো তা বাড়িতে চাইলে কেউ দেবে না।

আবার সেই কথা। এবার জিগ্যেস না করে পারলাম না। বল্লাম, বাড়িতে কে আছেন ?

—সবাই আছেন, বাবা মা—

—মা বেঁচে ?

—আপন মা নয়। তাহোলে আর ভাবনা ছিল কি ? বিমাতা। বাবা বুড়োবয়সে বিমাতার বশ। আমি কেউ নই বলেই মনে হচ্চে। বাড়ি থাকি, ছুটো খেতে পাই এই পর্য্যন্ত। একটা পয়সা হাতখরচ দেবে না। আই লাইক টু বায় বুকস্। আই নিড্ এ নিউজ পেপার—এসব কোথা থেকে হয় বলুন।

—তাইত !

কি আর বলি। লোকটি আমাকে বড়ই বিপদে ফেললে দেখচি। সাংসারিক ব্যাপারের এ সব কথা আমাকে শোনানোর দরকার কি ? বলেই ফেল্লাম কথাটা শেষে।

—আপনার তো চাক্‌রী করা উচিত ছিল—

—ওই যে বল্লাম, আই এ্যাম এ প্রিজনার ইন্ মাই ওন্ হোম্—

একথাটি বার বার বলে কেন? কে তোকে বেঁধে রেখেচে দড়ি দিয়ে বাপু? আর তাহলে তুমি এখানেই বা আসো কি করে? যাক্, ও সব কথায় আমার কোনই দরকার নেই।

চুপ করেই রইলাম।

হঠাৎ সে বল্লে, হ্যাঁ, আমার ইংরিজি কবিতাটি শুনুন—

—বেশ, বেশ আনন্দের সঙ্গে শুনবো—

—একটু বাইরের দিকে নির্জ্জনে চলুন, এখানে আবার মেলা লোক রয়েচে। না থাকলেও জমে যাবে কবিতার আবৃত্তি শুনলে—

লাইব্রেরীর বাঁ দিকে মাঠের মধ্যেকার একটা কৎবেল গাছ, তার পাশে বৈঁচি ঝোঁপ, তার পাশে একটা ডোবা। এই নির্জ্জন জায়গাটাতে বৈঁচি ঝোপের আড়ালে সে আমায় নিয়ে গিয়ে হাত পা নেড়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে—"ও মাই বিলভেড ইংল্যাণ্ড!" এই হোল তার কবিতার প্রথম লাইন। বেশ চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে। ইংরিজি কবিতাটিও মন্দ লেখেনি—তবে কি আর শেলি, শেকস্‌পিয়ার, জন ডন্ কিংবা ব্রাউনিংয়ের মত হবে ওর কবিতা? না তরু দত্ত বা রবীন্দ্রনাথের মত হবে? একজন বাঙালী যুবকের সাধারণ বুদ্ধিবিদ্যার পক্ষে মন্দ নয় শুধু—ভালো।

আমার সত্যি আশ্চর্য্য লাগলো। এর মধ্যে দেখচি জিনিস আছে।

লাইব্রেরীতে স্কুলের ইংরিজি পড়ানোর মাষ্টার ব্রজেনবাবু বসেছিলেন, তাঁকে ডেকে ওর আবৃত্তি শোনালাম। তিনি বল্লেন, বাঃ বাঃ সত্যি খুব ভালো। আপনি কি করেন?

আমি বল্লাম, কিছুই করেন না। দিন না আপনাদের ইস্কুলে একটা চাকুরী।

যুবকটিও হাত কচলে বিনীত ভাবে বল্লে, দিন না, তা হোলে তো খুব ভালো হয়।

ব্রজেনবাবু অপ্রতিভ ভাবে বল্লেন, আমি আপনার মত লোকের চাকুরীর কি ব্যবস্থা করবো বলুন—হেড মাষ্টারকে বরং বলুন—বেশ ইংরিজি জানেন আপনি।

যুবক উৎফুল্ল মুখে বল্লে, কলেজে আমাদের ক্লাসে আমার নাম ছিল দি পোয়েট—শ্যামসুন্দর রায়কে চেনেন তো? চেনেন না? ও আমার ক্লাস মেট্। ফিলজফিতে অনার্স ছিল ওর। কলেজ লাইব্রেরীতে বসে দুজনে এক সঙ্গে পড়াশুনো করতাম। বিলেত যাওয়ার কত সখ ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে বসে দুজনে এই রকম বই পড়বো কল্পনা করতাম। বল্লাম যে আপনাকে কলেজের দিনগুলো, নাইনটিন থার্টিনাইন টু নাইনটিন ফর্টিটু—এই গিয়েচে বেষ্ট ইয়ার্স অফ মাই লাইফ—আর সে সব দিন ফিরবে না—

আমি কৌতূহল অনুভব করছিলাম ওর কথায়। হাত পা নেড়ে বেশ কথা বলে। বলবার ক্ষমতা আছে। এ সব অজ পাড়াগাঁয়ে বসে ওই সব অতীত দিনেব গল্পের সময় যে ছবিটা ওর মনে জাগে, ও সুখ পায় তাতে। সুতরাং বলতে ভালবাসে সে সব গৌরবোজ্জল দিনগুলির কথা। ওর জীবন ওর কাছে বড়। আমি তার কি বুঝি?

আরও বুঝলাম বেচারি শ্রোতা পায় না। এ সব কথা শুনবার লোক এ অজ পাড়াগাঁয়ে নেই। তাই বোধ হয় আমার খোঁজ করে আমায় বার করেচে। শুনিয়ে ওর সুখ হয়, আমার শুনতে আপত্তি কি?

বল্লাম, আপনার বন্ধু শ্যামসুন্দরবাবু এখন কোথায়?

ওর মুখখানা কালো হয়ে গেল যেন। কি যেন একটা ব্যথা

পেয়েচে। কি একটা কথা খানিকক্ষণ ভাবলো। তারপর আস্তে আস্তে বল্লে, সে লণ্ডনে থাকে।

—লণ্ডনে? কিছু পড়তে গিয়েচেন?

—ইণ্ডিয়া অফিসে চাকুরী করে আর সেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করে। যা আমরা বসে বসে কল্পনা করতাম, তাই। আমার হোল না, ওর হোল। আর আমি এই পাড়াগাঁয়ে বসে বসে—

সান্ত্বনার সুরে বল্লাম, কি আর করবেন বলুন। এমন কত হয়—

—হয় জানি। কিন্তু –

আবার সেই স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে বৈচি ঝোপ আব ডোবার ওধারে দীর্ঘ টানা, দূরবিস্তৃত আউস ধানের মাঠের কচি কচি সবুজ ধানের জাওলার দিকে চেয়ে রইল। তারপরে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, জানেন? ডেভন্‌শায়র ইজ দি ফেয়ারেষ্ট কান্‌ট্রি ইন্ ইংল্যাণ্ড? লর্ণা ডুনের লেখক বলে গিয়েচেন। ওঃ হ্যারো লেন্‌স্ অফ ডেভন্। কত জিনিস ঘটে গিয়েচে ডেভন্‌শায়রে। ডেন্‌স্‌রা এসে ওর গ্রামগুলো পুড়িয়েছিল, স্প্যানিয়ার্ডরা ওর কোষ্ট আক্রমণ করেচে। ইংল্যাণ্ডের সিভিল ওআরে ওখানকার লোক লড়েছে। সমস্ত ডেভনশায়র একসময়ে বনভূমি ছিল। হরিণ চরে বেড়াতো। –র‍্যালে, ড্রেক, হকিন্‌স্ সব ডেভনের লোক। বিরাট মুরল্যাণ্ড, বাল্যকাল থেকে কত সাধ ছিল, সন্ধেবেলা মুরল্যাণ্ডে বেড়িয়ে বেড়াবো, ক্রমলেক দেখবো। লর্ণা ডুন পড়ে পাগল হয়েছিলুম কলেজে, ডুন কান্ট্রি দেখবো, ব্ল্যাকমুরের অমর কাহিনী।—লিণ্টন! লিন্‌মাউথ! ইন্‌ফ্রাকুম্ব!—এ সব কতদিনের স্বপ্ন—হোল না। কোথায় ডেভনশায়র লেনের সৌন্দর্য্য, কোথায় ডার্টমুর, আর কোথায় পড়ে আছি চালতেপোতা গাঁয়ে বাঁশবাগানে মশার কামড় খেয়ে!—কি

অদ্ভুত ট্রাজেডি অফ ফেট্! তাই ভাবি। শ্যামসুন্দর দিব্যি দেখ্‌চে। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবি ও লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বেঁড়াচ্চে, উইণ্ডারমিয়াব দেখচে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেক অঞ্চল দেখচে আর আমি কি করচি? ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে যায়—রাত্রে ভালো ঘুম হয় না।—কি হোতে চলেছিলাম, আর কি হোলাম! জানেন, ইংল্যাণ্ডকে এত ভালবাসি! কেন জানিনে, মনে মনে এত ভালবাসি! কত সাধ ওখানে যাবো—আমাবই হোল না।

কি বিপদ, ডোবার ধারে বৈচি ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে এ উইণ্ডারমিয়ার হ্রদের ছবি দেখতে লাগলো! লোক জমে যাবে এখুনি ওর উত্তেজিত কথাবার্ত্তা শুনে। অবিশ্যি এখন কেউ নেই এখানে। ব্রজেন বাবু আবৃত্তি শুনবার পরে চলে গিয়েচেন। আমি আবার সান্ত্বনার সুরে বল্লাম,—আপনার বয়েস বেশি না, কত বেশি বয়সের লোক বিলেতে যাচ্ছে না কি? আমার এক বন্ধু এতকাল পরে এবার এক মালজাহাজে ডান্‌বার বন্দরে গেল। সে ইস্কুল মাষ্টারি চাকরী পেয়েছে ভিক্টোরিয়া নায়ান্‌জা হ্রদের ধারে একটা ছোট শহরে। অনেক ভারতীয় আছে, তাদের ইস্কুল আছে, সেই ইস্কুলে। দেখুন তো, মনের কত তেজ ও উৎসাহ? ভারত স্বাধীন হয়েছে, এখন ভারতের তরুণদের সামনে কত বিস্তৃততর ক্ষেত্র, কত কাজ কত দিকে, কত দেশে কত ডাক পড়বে! আর্মিতে যান, নেভিতে যান, ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে ঢুকবার চেষ্টা করুন, ব্যবসা করুন, খবরের কাগজে লিখুন, বই লিখুন, বক্তৃতা করুন—আপনি এ বয়সে বসে থাকবেন কি? কিসের বলচেন বন্দী, বন্দী? কিসের বন্দী আপনি?

যুবক বসে বসে আমার কথা শুনলে। কোনো উত্তর দিলে না। বিশেষ কোনো উৎসাহ পেয়েছে আমার কথা থেকে বলেও মনে হোল না।

একটু পরে সে বল্লে, আমার অবস্থা জানেন না। কি কষ্টে যে আছি, তা' আমি জানি—আই এ্যাম রিয়্যালি এ প্রিজনার ইন মাই ওন হোম—মানে বাবা এ বয়সে আমার বিমাতার বাধ্য। তিনি সংসারের তবিল রাখেন বিমাতার কাছে। আমার একটা পয়সা নিতে হলেও বিমাতাব কাছে চাইতে হবে। তিনি মুখ ভার করেন পয়সা চাইলেই, পারতপক্ষে দিতে চান না। বাবা চাকরীর চেষ্টা করতে বলচেন, তাও তো কলকাতা যাবার গাড়ি ভাড়া চাই—এই কাছে রাণাঘাটে যাওয়ার পয়সা পাওয়া যায় না। তা' কলকাতার ভাড়া দিচ্ছে কে বলুন? এই পায়ে হেঁটে রোজ বিকেলে যতটা বেড়াই। কাজেই প্রিজনার ছাড়া আর কি বলুন—

—তাই তো দেখচি। তবে আপনি এ ভাবে বাড়ি বসে থাকলেও ত এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। আপনাকে বাড়ী থেকে বেরুতে হবে, তা যতই দুঃসাধ্য হোক। আপনি কি বিয়ে করেচেন?

যুবক ঈষৎ কুণ্ঠা ও লজ্জার সঙ্গে বল্লে, তা করেচি।

ও।

সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই। যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও জটিল। স্ত্রী এবং সম্ভবতঃ দু'একটি পুত্র কন্যা নিয়ে ইনি পিতার সংসারের বেকার অতিথি, এই বর্ত্তমান দুর্মূল্যতার বাজারে।

যুবক যেন খানিকটা আপন মনেই বলতে লাগলো, কত আশা ছিল। এখনো সে আশা আমি ছাড়িনি। বিলেত আমি যাবোই। এই মূর্খ আন্‌লেটার্ড পাড়াগাঁয়ে আমি বেশি দিন পড়ে থাকবো না। একখানা ভাল বই কি কাগজ পাইনে পড়তে। অথচ এত পড়তে ভালবাসি। শেলির একটা ভাল এডিসন কিনবো, বাবার কাছে টাকা

চাইলেও পাবো না জানি, কেননা টাকা তাঁর কন্‌ট্রোলের মধ্যে নয়। আর একটা কথা আপনাকে বলি—

—হ্যাঁ বলুন।

—আমি একখানা ভালো উপন্যাস লিখেচি—হু'ভলুম—বড় উপন্যাস। আপনাকে একদিন শোনাবো।

—বেশ বেশ। যেদিন ইচ্ছে শোনাবেন।

—আপনার কবে সময় হবে?

—বিকেলে যে কোনদিন আসতে পারেন।

—আপনি দেখে দেবেন উপন্যাসখানা তারপর একজন পাবলিশার ঠিক করে দেবেন আমাকে। দেখি, আপনাব দয়ায় যদি এবার মুক্তি পাই বন্ধন থেকে। আমি তাহোলে বাঁচি—আমি বাঁচি—উঃ আমি মবে যাচ্ছি —আপনি জানেন না—থ হোয়াট এগনি এ্যাণ্ড টর্চ্চার আই এ্যাম পাসিং—

বেলা গিয়েছিল!

বৈঁচিঝোপে রাঙ্গা রোদ এসে পড়েছিল।

লাইব্রেরী থেকে লোক চলে যাচ্ছে, পাড়াগাঁয়ের লাইব্রেবী কেরোসিন তেলের খরচ জোগাতে পারে না।

বাহুড় উড়ে যাচ্চে বাঁওড়ের ওপার দিয়ে।

এই সন্ধ্যার আকাশের তলায় এই যুবকের মনের বেদনা আমাকে স্পর্শ করলে।

কিসের বাঁধনে এই লেখাপড়াজানা লোকটি পড়েচে, তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারলাম।

একটি স্নেহময় পিতার বড় আদবের জ্যেষ্ঠ পুত্র—একদিন যার জন্মলগ্নে শুভশঙ্খ বেজেছিল একটি আনন্দ মুখর গৃহস্থ-বাটিতে, আজ

সেই পুত্র বড় হয়েচে, শিক্ষিত হয়েচে—বিবাহ করেচে—তবুও সেই পিতা আজ অসুখী কেন? সেই পুত্রই বা কেন সেই গৃহে নিজেকে নিজে বন্দী বলে মনে করচে আজ! প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের লাজাবন্ধন ন্যায় কাকে বলে আজ ভালোভাবে বুঝলাম।

যুবক বল্লে, তবে আজ আসি—সন্ধে হয়ে যাচ্চে। আমার কি, আমি রাত হোলেও অন্ধকারে যেতে পারি—যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততটুকুই ভালো থাকি—

—না না, দেরি না করাই ভালো। চালতেপোতা গ্রামের রাস্তা বড় খারাপ—

—তাহোলে উপন্যাসখানা কাল নিয়ে আসবো? দেখবেন একটু? ভাল উপন্যাস। চুর্ণি নদীব ধারে বেড়াচ্ছিলাম। একটা ডুমুর গাছেব তলায় বসে মনে কেমন ভাব এসে গেল। কি চমৎকার যে লাগলো! যেন কোথায় এসেচি। কি সুন্দর পৃথিবী। অমনি এই উপন্যাসের প্লটটা মনে এসে—

—বুঝেচি। আসবেন কাল। নমস্কাব।

যুবক প্রতিনমস্কার করে ছন্নছাড়া হতভাগ্যের মত শূন্যদৃষ্টি নিয়ে একবার চারদিকে চাইলে। কি দেখলে চেয়ে জানিনে, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। তারপর হন্ হন্ করে মাঠ পার হয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠে হেঁটে চালতেপোতার দিকে চললো। বড় মমতা হোল ওর ওপর। ওর মনে রস আছে, অনুভূতির যাওয়া আসা আছে, তা সত্ত্বেও ওর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে ওর বাপের চোখের সামনে। ওর তরুণী স্ত্রী রয়েচে বাড়িতে, তবুও ঘরে ফিরতে ওর মনে আনন্দ নেই। এত কষ্ট করে দু' ভলুম উপন্যাস লিখে কোন্ সার্থকতা আসবে ওর জীবনে! আমি জানি কোনো প্রকাশকই হঠাৎ তো ওর মত অজানা লেখকের

উপন্যাস ছাপতে চাইবে না--ভালো হোলেও না। ওর লেখক হওয়ার আশা আকাশ-কুসুম, যেমন আকাশ-কুসুম ওর বিলেতে যাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

লাইব্রেরীতে ফিরে গেলাম।

সেখানে দু' একজন তখনো বসেছিল। একজন বল্লে, পাগলাটা চলে গেল? আচ্ছা ভ্যাজোর ভ্যাজোর আরম্ভ করে দিয়েছিল আপনাকে নিয়ে সন্ধের সময়—

—কে পাগল?

—আরে ওর যে মাথায় গোলমাল। জানেন না? সেই জন্যই ওর বাবা ওকে কোথাও বেরুতে দেন না। কেবল বলে, বিলেত যাবো, এখানে যাবো, ওখানে যাবো। সৎমা বড় কড়া, ওকে ঠিক শাসনে রেখেচে। ওর নামই হোল পাগলা যতীশ, ভীষণ ছিট-গ্রস্ত—ওর বাবা সেদিন বড় দুঃখ করছিলেন ইষ্টিশান মাষ্টারের কাছে। বলছিলেন, এত আশা করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন—বিয়েও দিয়েছিলেন, ছেলেও বি. এ. পাশ, অথচ সব কিছুই গোলমাল হয়ে গেল।

সত্যি তো। ছেলে হোল, সে ছেলে শিক্ষিত হোল, বিয়েও করলে। সে ছেলে ভাবুক, কবি, মার্জ্জিতরুচি, অনেক কিছু জানে, অনেক কিছুর খবর রাখে।

তবে কিসের অভাবে সে সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়ালো আজ? এর উত্তর কে দেবে? কেন এমন হয় কি জানি!

থনৃটন্ কাকা

রজনী বাবুদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে সেদিন ছোট খাটো একটা সাহিত্যিক বৈঠক ছিল। তর্ক আলোচনা ও প্রচুর খাওয়া দাওয়ার মধ্যে সন্ধ্যা বেশ ভালোই কাটলো। রজনী বাবু বর্ত্তমানে সাত আটটা বড় কয়লা খনি, বর্দ্ধমান জেলায় জমিদারি ও সিংভুম জেলার শালবন ও মৌজাব মালিক, এসব বাদে কলকাতায় বাড়ি জমি তো আছেই নানাস্থানে।

বজনী বাবু বল্লেন—বসুন, বসুন! বেশি রাত হয়নি এখনো। পৌঁছে দেবো এখন গাড়িতে। একটা গল্প বলি।—আমাব তখন বয়েস ন বছব। আমাদের বাড়ি বর্দ্ধমান জেলার বনপাশ ষ্টেশন থেকে তুক্রোশ দূরে একটা ক্ষুদ্র গ্রামে। গ্রামের বাইরে অবধি মাঠ, শুধুই ধান হয় সে মাঠে, মাঠের মাঝখানে বড় বড় তালগাছে ঘেরা সেকেলে দীঘি, তার নাম 'গলাকাটা পুকুর'। বহু আগে যখন ও সব দেশের ওইসব তেপান্তর মাঠে নির্ব্বান্ধব পথিকদের গলা কেটে ডাকাতেরা লাস বেমালুম দীঘির জলে পুঁতে রাখতো, তখন থেকে ওই নামে চলে আসচে দীঘিটা।

একবার রোদপোড়া মাঠে চৈত্র তুপুরে আমি আর গ্রামের তুটি ছেলে মাছ ধরচি, 'হঠাৎ একটি ছেলে, তার নাম হরু, রামচন্দ্র সাবুইয়েব ছেলে, আজও, মনে আছে, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ও কে—ওই দ্যাখ—

জ্যোতিরিঙ্গণ

—কে রে? কই, কোথায়?

—ওই তো বসে।

তারপর সবাই মিলে কাছে গিয়ে দেখলাম তালগাছের তলায় এক সাহেব বসে, তার পরণে অতি জীর্ণ ও মলিন, তালি দেওয়া প্যাণ্টালুন, তেমনি কোট, তেমনি জুতো।

আমরা কাছে যেতে সাহেব কি একটা বল্লে, আমরা বুঝতে পারলাম না। যে সময়ের কথা বলচি, তখন একজন সাহেবকে এ অবস্থায় অজ পল্লীগ্রামে দেখা খুব একটা আশ্চর্য্য বিষয় ছিল। আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করচি, এমন সময় সাহেবটা আবার কি যেন বল্লে।

হরু বল্লে, ও খেতে চাইচে ভাই।

আমারও তাই মনে হোল।

আমি হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম—আমার সঙ্গে এসো—

সেই সাহেবকে নিয়ে আমাদের বাড়ি এলাম।

বাবা অবাক হয়ে এগিয়ে এলেন। তিনি মাইনর স্কুলের সেকেন মাষ্টার, আমাদের বাড়িতে দু' তিনটে ধানের গোলা ছিল, চল্লিশ বিঘে ধানের জমি ছিল, পুকুরে মাছ ছিল, জিনিষ পত্রও তখন সস্তা ছিল। সংসার ভালোই চলতো, মোটা ভাত কাপড়ের অভাব ছিল না।

বাবা সাহেবকে বাইরের ঘরে একটা টুলের ওপর বসালেন। চেয়ার ছিল না আমাদের বাড়ি। ইংরিজিতে কি কথা তার সঙ্গে বল্লেন। তারপর আমাকে বল্লেন বাড়ির মধ্যে যা, তোর দিদিকে গিয়ে বলগে এক বাটি মুড়ি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে। সাহেব খাবে।

আমি কিছু আশ্চর্য্য হয়েই দিদিকে গিয়ে কথাটা বল্লাম। আমার মা এ সময় খুব পীড়িত, আমার ছোট ভাই বিনয় তখন সবে মাস খানেক হোল জন্মেছে, মার শরীর সেই থেকেই খারাপ। দিদি কাঁসার বড় জাম বাটিতে মুড়ি, দুধ আর তালের গুড় এক সঙ্গে মেখে আমার হাতে দিয়ে বল্লে কেমন সায়েব রে?

—ভালো সায়েব।

—চল আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আসি।

আমার দিদির নাম ছিল বীণা। আমার সে দিদি মারা গিয়েচে বহুদিন। বাবার মুখে সব শুনলাম। সায়েব আসচে বরাকর থেকে, গরীব, ওর কেউ কোথাও নেই। বাবার কাছে আশ্রয় চেয়েচে, বাবা বলেচেন থাকো। তবে আমাদের ঘরে যা জোটে, তাই খেতে হবে।

সায়েব তাতেই রাজি হ'য়েচে।

সেই থেকে সায়েব আমাদের বাড়িই রয়ে গেল। গাঁয়ের লোক দলে দলে আসতে লাগলো সায়েবকে দেখতে।

আমরা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলতাম, ওই তো সায়েব বসে আছে—

বাইরের ঘরে সায়েব থাকতো। কৃষাণের জন্যে একটা ছোট তক্তাপোষ পাতা ছিল সেখানে অনেক দিন, সেইখানে পুরণো তোষক ও থলের চট, একখানা পুরনো চাদর ও একটা বালিস, একটা ছোট মশারি দিয়ে সায়েবকে শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন বাবা। একখানা লোহার কলাই-করা সান্‌কি আর একটা কলাই-করা গেলাস, এই আমরা দিয়েছিলাম ওকে, তাতে সে ভাত খেতো।

সায়েবের নাম ছিল থর্ণটন্। আমার মুখে ভালো উচ্চারণ

হোতো না, আমি বলতাম থন্‌টন্‌ কাকা। কেউ বলতো ঠন্‌ঠন্‌ সায়েব।

আমাদের যা রান্না হোত, থন্‌টন্‌ কাকাকে তাই দেওয়া হোত। দিদি এসে মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে বল্লে, থনটন কাকা খেতে জানে না, মাছের ঝোল আর তালের গুড় একসঙ্গে মেখেচে।

ওর কথা শুনে আমি গেলাম দেখতে। সে এক কাণ্ডই করচে সায়েব। ডাল খায়নি, অথচ মাছের ঝোলে তালের গুড় দিয়ে মেখে চুমুক দিচ্ছে।

বল্লে—ও, ইট ইজ্‌ সো হট!

কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝলাম, ফার্ষ্ট বুক্‌ পড়ি, মানে করলাম, ইহা হয় এত গরম!

কিন্তু গরম তাই কি? তালের গুড় মাখলে কি গরম কমবে?

পরে বাবা বলেছিলেন ওর মানে, খুব ঝাল। মাছের ঝোল খুব ঝাল হয়েছিল। হয়ই আমাদের বাড়িতে।

বাবা বলেছিলেন, সায়েবের তরকারিতে ঝাল কম দিতে।

আমি আর দিদি ওকে খেতে শেখালাম। কিসের পর কি খেতে হয়, কি জিনিসটা কি ভাবে মাখতে হয়! থনটন কাকা আমাদের বিশেষতঃ দিদিকে বড় ভালবাসতে স্বরু করলে। ক্রমে এক আধটু বাংলাও শিখে ফেল্লে আমাদের কাছে।

দিদিকে বলতো অদ্ভুত বাঁকা সুরে—বী-ণা। ডাল ডেও—বাট্‌ ডেও নো—ডাল ডেও।

দিদি হাসতে হাসতে বলতো—ভাত দেবো না কাকা?

—নো। বাট্‌ ডেও নো।—ডাল ডেও।

—বেগুন ভাজা দেবো? এই যে—এই—দেবো?

—নো।

থনটন কাকা বুড়ো লোক, পরে আমরা আবিষ্কার করলাম। সায়েব লোকের বয়েস প্রথমটা আমরা বুঝতে পারি নি।

আমাদের সে তাসের খেলা শেখাতো বাদলার দিন বসে বসে। আমাকে ইংরিজি পড়াতো বটে তবে তার বাঁকা বাঁকা জড়ানো উচ্চারণ আমি প্রথমটা বুঝতেই পারতাম না। একদিন বাবাকে বল্লাম—বাবা সায়েব কাকা ইংরিজি জানেন না—

—সে কি?

—কি রকম বলে, হাসি পায়—

—ও যা বলে, ওই ঠিক উচ্চারণ। আমাদের মুখেই হয় না। ও ঠিক বলে। ও যা বলে তাই শিখবি।

থন্‌টন্‌ কাকা আমাদের গাঁয়ে পুরনো হয়ে গেল। রামায়ণ গানের আসরে, কবির আসরে সায়েব গিয়ে বসতো সকলের সামনে। করুণ গান শুনে হয়তো খুব হাততালি দিলে হাসিমুখে—এই রকম বুঝতো।

একখানা মোটা বই বের করে মাঝে মাঝে পড়তো—বাবা বলতেন ও বইকে বলে বাইবেল। সায়েবদের ধর্ম্মপুস্তক।

সন্ধের সময় ডাকতো—বীণা—

দিদি এসে বলতো—কি থনটন কাকা?

—খাটে ডাও।

—এখন রান্না হয় নি। মুড়ি দেবো?

—নিয়ে এসো। টেল নো—

—না, তেল দেবো না। গুড় দেবো?

—গুড় ডাও।

এইভাবে দু'বছর কাটলো আমাদের বাড়িতে। তখন সে বেশ বাংলা শিখেচে, এমন কি নিজের নাম বাংলায় লিখতো—জেমস থনরটন্।

আমি বললাম—ও কাকা, ভুল হয়েছে। থনরটন্ কি? থর্ণটন্ হবে। এই দেখো—একে বলে রেফ্, এই বসাও। এবার হোল থর্ণটন।

—নো, নো রেফ্ এ্যাণ্ড অল দ্যাট্। এই ডেখো—

—বেশ দেখি—

সায়েব লিখলো—থরনটন্—

আমার দিকে চেয়ে বল্লে, ঠিক?

—না ঠিক না। এই দেখ—

—ও, হ্যাং—হোক। আমি লিখবো—টোমার রেফ্ আমি লিখবো না।

—লিখো না। লোকে বলবে থরনটন্—

—লেট্ দেম্—বলটে ডাও।

—দিলাম।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে তাড়াতাড়ি সব আম পেকে গেল। আমি বল্লাম—থন্টন্ কাকা, আম পেড়ে নিয়ে আসি চলো পুকুর ধারের বাগান থেকে—

—আমি সব পাকা আম খাবে—

—খেও। লগা নিয়ে চলো, আম পাড়তে হবে।

কিন্তু আম পাড়তে যাবার আগে পিওন এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্লে, পড়তে পারো? এ বোধ হয় সাহেবের চিঠি—

জ্যোতিরিঙ্গণ

থন্‌টন্‌ কাকাকে চিঠিখানা দিলাম। চিঠিখানা পেয়ে হঠাৎ ওর মুখ কেমন হয়ে গেল। সেখানে খুলে পড়লে। পড়ে কি সব বলতে লাগলো ইংরিজিতে। আর নড়ে না. ওঠেও না। কখন আপনমনে হাসে, কি বিড়বিড় করে বলে। রাত্রে বাবার কাছে শুনলাম থনটন কাকা অনেক টাকা পাবে বিলেতে। ওর এক খুড়ী না পিসি ছিল, সে মারা গিয়েছে. ও তার সম্পত্তি পেয়েছে। বিলেতের উকীলেরা চিঠি লিখেছে।

মাসখানেকের মধ্যে থনটন কাকা দেশে চলে গেল।

তারপর যে কথাটা বলবার জন্যে এ গল্পটার অবতারণা সেটা এখন বলি।

যাবার কিছুদিন আগে থনটন কাকা বাবাকে বল্লে—আমার তুমি অনেক উপকার করেছ, তোমার একটা উপকার আমি যাবার সময় করবো। আমার সঙ্গে একজায়গায় চলো, রেলে যেতে হবে।

বাবা গেলেন।

বরাকর নদীর কাছাকাছি কোন একটা পাহাড়ের তলাকার শালবন আর লাল কাঁকুরে মাটির ডাঙা দেখিয়ে সাহেব বলেছিল বাবাকে—সমস্ত বাংলাদেশের কয়লার ক্ষেতের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কয়লা আছে এই জমির তলায়। আমি মাইনিং এঞ্জিনিয়ার, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। কেন আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, কেন এমন অবস্থায় পড়েছিলাম, সে কথা তোমাকে জানাবো সময় মত। এখন আমার পরামর্শ, এই জমি বন্দোবস্ত লও, কিংবা কেনো। কেউ জানে না এর তলায় কি অমূল্য সম্পদ লুকোনো। আমার কথা অবিশ্বাস কোরো না। একদিন ভেবেছিলাম নিজে আমি এই জমি কিনে নেবো বা বন্দোবস্ত নেবো। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা

আমার ঘট্‌লো না। তার জন্যে দুঃখিত নই। তুমি আমাকে নিজের ঘরে নিজের সহোদর ভাইয়ের মত স্থান দিয়েছিলে, তার খানিকটা প্রতিদান দিতে পেরে আমি সুখী হয়েছি। আমার কথা শুনো, বড় লোক হয়ে যাবে। বীণার বিয়েতে যৌতুক দিলাম এই জমি। কাউকে এসব কথা বলবে না। ঘুনাক্ষরেও না। তা হোলে সব যাবে।

বাবা বাড়ি এসে মাব গহনা বিক্রি করে টাকা নিয়ে আবার চলে গেলেন বরাকরে।

সন্ধান নিয়ে জানলেন নিকটবর্ত্তী পালন্‌ডি মৌজার ডিহি গাঁচপুর কাছারির জমিদার গঙ্গারাম মাহাতোর দু আনি অংশের জমি ওটা। কলকাতার গৌরমোহন পাল দিগর বর্ত্তমানে মালিক।

গেলেন কলকাতায় জমিদারদের বাড়ি। গৌরমোহন পাল দিগরের নায়েবকে কুড়ি টাকা ঘুস দিলেন। নায়েব নক্সা ও কাগজপত্র দেখে বল্লে—এ জমি বহুকাল থেকে পতিত। এ আপনি কি করবেন ?

নায়েবের সুরের মধ্যে যেন সন্দেহের রেশ রয়েছে।

বাবার বুক কেঁপে গেল। মনের অগোচর পাপ নেই। বাবা বল্লেন—চাষ বাস করবো।

ঘুঘু নায়েব হেসে বল্লে—সে কি মশায় ? পাথুরে ডাঙ্গায় কি চাষ হবে ? চাষের জমি হোলে এতকাল ও জমি পতিত থাকে ? তা ছাড়া ওর ত্রিসীমায় জল নেই। কিসে চাস করবেন ?

—গরুমহিষ পুষবো, চাষ করবো, বাসও করবো, সবরক মই—

নায়েব চোখ মিট্‌কি মেরে বল্লে—আমায় কি দেবেন ?

—কেন গরীবের ওপর জুলুম করবেন। আপনাকে খুশি করবো।

—কত ?

—একশো টাকা।

—না। ওতে হবে না।

—দেড়শো ?

—না।

—কত বলুন ?

—দশ হাজার টাকা। পাঁচবছর পরে। নগদ দিতে হবে না। লেখাপড়া করুন। এরা কলকাতার বড়লোক, এরা কি জানে মশাই, আমি আন্দাজে বুঝেছি। তবে আপনাকে নগদ দিতে হবে না। একটী কর্জ্জনামার খত রেজিষ্টি করা থাকবে। বুঝলেন ? আপনি দশহাজার টাকা ধার নিলেন আমার কাছ থেকে।

--সে হবে না। রেজিষ্ট্রার টাকার লেনদেন নিজের হাতে করবে। দশহাজার টাকা কে দেবে !

—তার ব্যবস্থা হবে। সব রোগের ওষুধ আছে।

জমি রেজিষ্টি হয়ে গেল।

তবে আমরা জমিদারকেও ফাঁকি দিইনি। এখন সে জমির আয় বার্ষিক নিট্ দেড় লক্ষ টাকা।

জমিদারের নাবালক ছেলেকে আমরা দুই হাজার টাকা ফি বছর দিই।

আমাদের যা কিছু দেখচেন, সব সেই পালন্ডি কয়লার খনি থেকে। এখন আমাদের দশটা কলিয়ারি, কোনোটাই কিন্তু পালন্ডির মত নয়। পালন্ডি লক্ষীর ঝাঁপি। থর্নটন কাকার ছবি দেখবেন ? চলুন পাশের ঘরে। না, আসল ছবি বা ফটো নয়। আর্টিষ্টকে দিয়ে আঁকিয়েছি। আমি চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলাম অবিশ্যি যতটা মনে ছিল।

জ্যোতিরিঙ্গণ

রজনীবাবু গল্প শেষ করলেন। বল্লেন—চা খান আর একবার।

আমি বল্লাম—সাহেবের আর কোনো খবর পান নি?

—কিছু না। আমার মনে হয় বিলেত যাওয়ার পথেই মারা গিয়েছিল। নইলে অন্ততঃ বীণা দিদির খবর সে নিশ্চয় নিতো। চলুন থর্ন্‌টন কাকার অয়েল পেন্টিং দেখাই। থর্ন্‌টন কাকা ভাঙা লোহার সান্‌কিতে ভাত খাচ্ছে, এই ছবিটাই আঁকিয়েছি। আসুন এই ঘরে।

কালচিতি

কালচিতি গ্রামের নারান হাঁসদা এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেল ওদের গ্রামে যাবার জন্যে।

কালচিতি এখান থেকে পাকা দশ মাইল দুর, ডিবুডুংরি ও সারোয়া দুটি জঙ্গলাবৃত পাহাড় পেরিয়ে তবে। দুর্গম রাস্তা।

যাওয়ার প্রয়োজনও ছিল। এই চালের বাজার, জিনিষপত্র দুর্লভ বটে, আক্রাও বটে। ভাল দুধ তো দেশ থেকে উঠেই গিয়েচে। নারান হাঁসদা ও গ্রামের প্রধান, আমার মক্কেল। তাকে অনেকদিন থেকে বলছিলাম ওদিকে কিছু ধানের জমি পাওয়া যায় কিনা। এবার এসে সে খবর দিল, ত্রিশ বিঘা ভালো জমি এক বন্দে আছে, সেই সঙ্গে

একটা পুকুর ও শাল মহুয়ার জঙ্গল। দরে সে কিছু সস্তা করে দিতে পারে.আমাকে, সেই যখন গ্রামের প্রধান।

সেদিন সকালে সে একখানা গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিল। গাড়োয়ানের হাতে একখানা চিঠি, তাতে লেখা আছে আমি যেন বাড়ির মেয়েদের নিয়ে যাই।

দুপুরে আহারাদির পর কালচিতি রওনা হোলাম। মাইল দুই গিয়ে টাউনের সীমা ছাড়ালাম তারপর একটা ঝাঁটি শালচারার বন, সেও মাইলখানেক—তারপরেই পড়লো ডিবুডুংরি পাহাড়। পাহাড়ের উপর এঁকে বেঁকে গরুর গাড়ি উঠতে লাগলো। তখন বেলা দুটো, আদৌ রোদ নেই, মেঘস্নিগ্ধ আকাশতল অথচ সকাল থেকে বৃষ্টি নেই, শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। পাহাড়ের চড়াইয়ে বড় বড় শাল, করম, আসানের ছায়াবহুল জঙ্গল, এক রকমের ছোট বাঁদর খেলা করে বেড়াচ্চে ডালে ডালে। করম গাছের হল্‌দে ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়েচে পাষাণময় পথের ওপর। যেন কে ইচ্ছে করে ছড়িয়ে রেখেচে।

আবার বহুদূর ঢালু পথে গরুর গাড়ি মন্থরগতিতে নামতে নামতে চলে।

গাড়োয়ান মুখে বলচে—ইঃ ইঃ—ডুংরিটা পেরিয়ে জল খাইয়ে লিবো চল্ ইঃ—শালের পাঁচন মারচে গরুর গায়ে।

পাহাড় পার হয়ে ঢালু বিস্তীর্ণ পথটা যেখানে সমতল ভূমিতে এসে মিশেচে সেখানে একটা পাহাড়ি নদী উপলরাশির ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে। পর্ব্বত্য নদীর বন্ধুর তটভূমিতে দু'পারেই কুটজ কুসুমের শোভা, চিহড় লতা অজগর সাপের মত বড় বড় শালগাছের গুঁড়িকে বেষ্টন করে উপরের দিকে উঠেচে। কম্‌ব্রিটাম লতার ছোট বড় ঝোপ একেবারে জল ছুঁয়ে আছে। পক্ষীকাকলীমুখর বড় সুন্দর স্নিগ্ধ

উপত্যকাটি। যেন এখানে সংসারের কোনো গোলমাল নেই। রাজাকরদের উৎপাতের কথা শুনতে হয় না সকালে উঠে, ব্ল্যাকমার্কেটের সংবাদ পৌঁছোয় না, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবাদের বার্ত্তা নেই এখানে। গাড়োয়ান বল্লে—নাম বাপু, জল খাইয়ে লিবো গরু দুটিকে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে একটা বড় শিলাসনে বসতে যাচ্ছিলাম। গাড়োয়ান বল্লে, উ ধারে যাবি না আজ্ঞে।

—কেন ?

—উ ধারে ভালুক ঝোড় আছে। ভালুকটা বাহিরাবে। গরু ডরাবে।

ভালুক ! পথের ধারেই দিনের বেলা ভালুকের ভয় ! মেয়েরা ভয় পেয়েই গেলেন। আমরা কাছেই বসলাম কিছুক্ষণ, তারপর আবার গাড়িতে উঠি।

এবার কিছুদূর গিয়ে একটা বন্য গ্রাম পড়লো, নাম কাড়াডোবা। ঘর কুড়ি-বাইশ মুণ্ডা খৃষ্টানের বাস, মকাই ক্ষেতে কাজ করচে মেয়েরা, বাঙালী মেয়ের মত সাড়ি পরনে। একটি মুণ্ডা যুবককে জিগ্যেস করলাম—কি নাম আছে ?

—পল্।

—ও মেয়ের কি নাম ?

—রত্না কুই।

একেবারে আধুনিক নাম 'রত্না'। খৃষ্টান মিশনারীরা ওদের লেখাপড়া শিখিয়ে অনেকখানি বাইরের আলো দিয়েচে যে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাস্তার দুধারে অবস্থিত সারবন্দী ওদের বাঁশ খড়ের ছোট নিচু ঘরগুলির মেজে ও দাওয়া এলা মাটি রং করা, নিকানো পোছানো, দেওয়ালের বাইরে ধনেশপাখীর ছবি আঁকা, ভালুকের, পাহাড়ের ও ফুল গাছের ছবি আঁকা।

ওদের ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলে কোলে করে কৌতূহলের সঙ্গে বন্য মেয়েরা একদৃষ্টে আমাদের গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

একটি বৃদ্ধা গাড়োয়ানকে জিগ্যেস করলে—কুথাকার গাড়ি বটে?

—কালচিতি।

—কে আসচে সঙ্গে?

—ডাক্তারবাবু বটে।

—হোই।

আবার নির্জ্জন বনপথ। একেবারে নির্জ্জন। সন্ধ্যার পর বন্যহস্তীযূথ এ পথে বর্ষার ধানক্ষেতে নামে পাহাড় থেকে, পথের ধারের নরম মাটির বুকে তাদেব পদচিহ্ন এঁকে। সাদা মেঘপুঞ্জ থোলো থোলো জমেচে দূর শৈলমালার শিখরে শিখরে, কালিদাসের দেশের সানুমান আম্রকূটের ছবি মনে জাগিয়ে দিয়ে। সঙ্গে একখানি মেঘদূত যদি আনতাম, তবে ওই বন্যকুটজ বৃক্ষের তলায় পাহাড়ী নদীর পাড়ে পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে এমন মেঘমেদুর দিনের স্নিগ্ধ অপরাহ্নে সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের সুখমন্থর দিনগুলির কথা পাঠ করতাম, আর শুনতাম ধনেশপাখীর ডাক, শুনতাম বনময়ূরের কেকাধ্বনি। সহরের দোতলা ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির তলায় ও কাব্য পড়ে ওর প্রাণস্পন্দন কানে কেউ শুনতে পাবে না।

অনেকদুর যাবার পরে আর একটা গ্রাম পড়ল, এর নাম টেঁড়াপানি। একেবারে সাঁওতালি নাম, এর মানে, যে জায়গা থেকে জল দূরে। বহুব্রীহি সমাস।

এ গ্রামটিও খুব বড়ংনয়, খুব বড় গ্রাম এ অঞ্চলে বড় একটা নেই। এই গ্রামে একটা দেখবার মত জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একটা পাথরের চবুতারা, তার চারদিকে পয়োপ্রণালী। বহু পুরনো আমলে এখানে

নাকি প্রাণদণ্ডের আসামীদের শিরশ্ছেদ করা হোত, রক্ত গড়িয়ে পড়তো ঐ পয়োপ্রণালী দিয়ে। কে যে কার প্রাণদণ্ড দিত, তা বুঝবার কোন উপায় নেই– সম্ভবতঃ পুরনো প্রাক্-বৃটিশ যুগের কোনো বন্যরাজা…।

টেঁড়াপানি ছাড়িয়ে দু' রসি গিয়েই সারোয়া পাহাড়ের চড়াই সুরু হোল ক্রমোচ্চ বনপথের মধ্য দিয়ে। এই বর্ষাকালে ছোটোখাটো ঝর্ণা কুলুকুলু রবে এদিক-ওদিক থেকে সরবে নেমে আসচে, দ্রোণঘাসের ফুল ফুটেচে, যে ফুল তীরের মতো বিঁধে যায় কাপড়ে।

এ পাহাড়ে বড় গাছ অনেক বেশী, চড়াইয়ের পথ দুর্গমতর। কিন্তু শোভা সবচেয়ে চমৎকার। উচ্চতা এত বেশী যে, এখানে চড়াইয়ের মাথা থেকে বহু দূরে টাটানগরের ডালশ পাহাড় চোখে পড়ে। চারিধারেই ঢেউ টেলানো পাহাড়শ্রেণী কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু—দূরে দূরে পাহাড়গুলো ঘন-নীল, কালো মেঘের পটে ছবির মত।

একজন বুড়ো কাঠুরে লুদাম গাছের কাঠ কাটচে পাহাড়ের মাথায়। তার পরনে ইঞ্চি দুই চওড়া কাপড়ের কৌপীন মাত্র।

জিগ্যেস করা গেল—কি নাম রে?

—গমু সর্দ্দার।

—বাড়ি কোথায়?

—টেঁড়াপানি।

—তোর বয়েস কত?

—কি জানি বটেক?

—পঞ্চাশ হয়েচে?

—পঞ্চাশ হতে পারে, ত্রিশ হতে পারে।

—কি খেয়েচিস?

—নাই খাইল।

—তবুও ?

—সোঁধা চাল আর নুন।

অর্থাৎ ভিজে চাল নুন দিয়ে খেয়েছে। এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমন কি তরকারী পর্য্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাক ভাজা আর নুনের টাক্‌না দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্ত্তি পান্তভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদেব সবল, স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতী আর ভীষণ বিষধর শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে, আর ভালুক ? সে তো এদের ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরে।

আমাদের গাড়ির একটি মেয়ে হাসতে হাসতে বল্লে—হ্যাঁ গমু সর্দ্দার তোমার বয়েস পনেরো পর্য্যন্ত হয়েচে কি ?

—তা হতে পারে বটে।

—তাহোলে বড্ড বয়েস হয়েচে তোমার ?

—হ্যাঁ, রেলটা বসলো চাঁইবাসাতে, তখন আমি কাড়া চরাই আজ্ঞে। তুমি আগুন দিলি ?

—কি ?

আমি বুঝিয়ে বল্লাম গমু দেশলাই চাইচে। পিকা খাবে। পিকা অর্থাৎ কাঁচা শালপাতায় জড়ানো তামাকের পাতা, বিড়ির আকারের বটে তবে আধহাত লম্বা। বাজারের বিড়ির চেয়ে পিকা খেতে অনেক ভাল লাগে। এই সব বন্য অঞ্চলের কোনো লোকেই বাজারের তৈরী বিড়ি কিনে খায় না।

জিগ্যেস করলে বলে—উ উদাস লাগচে রে।

এবার সারোয়া পাহাড় থেকে পথ নামলো। ঐ পথটা আগের

পাহাড়টাব উৎরাইয়ের মত অতটা ঢালু নয়। অর্থাৎ রাস্তাটা দিয়ে আরোহী বোঝাই গরুর গাড়ি নিয়ে নামা একটু বিপদজনক। নামবার রাস্তার একপাশে খাদ বেশ গভীর। গরু যদি ভয় পেয়ে একটু এদিক ওদিক নিয়ে যায় তবে ঐ খাদে আরোহীপূর্ণ গাড়ির সমাধি সুনিশ্চিত।

ঢালু পথটা যেখানে সমতলে এসে মিললো, সেখানেই কালচিতি গ্রাম। অর্থাৎ সারোয়া পাহাড়েব এপারে টেঁড়াপানি আর ওপারে কালচিতি, মাঝখানে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে। এই গ্রামটা এদিকের মধ্যে বড়। অনেক ঘব লোকেব বাস, এদেব মধ্যে অনেক বাঙালী অধিবাসীও আছে। বাঙালী অধিবাসীদের পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল আগে বাঁকুড়া বা মেদিনীপুর জেলা থেকে এসে এখানে বাস করেছিল, এই বনাঞ্চলের পরিবেশের মধ্যেও এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক বজায় রেখে চলেচে।

আমরা নারান হাঁসদার বাড়ি গিয়ে উঠলাম। খড়ের বাড়ি, মাটির দেওয়াল, মাঝখানে বড় একটা চওড়া ঘর, তার চার পাশে কুঠুরি, শালকাঠের দরজা জানালা। কোথাও চুণ সিমেণ্টের বালাই নেই। নারান হাঁসদার মুখে শুনলাম এ ঘর অন্ততঃ সত্তর বছর আগে তৈরি, অথচ মাঝে মাঝে নতুন ছাউনি দেওয়া ছাড়া অন্য বিশেষ কোনো খরচ নেই এর পেছনে। নারান হাঁসদাব বাড়ির মেয়েরা এগিয়ে এসে গাড়ি থেকে আমাদেব বাড়ির মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে গেল। তাদের পরনে ফর্সা সাড়ি, গায়েও ব্লাউজ, এমনি অজ বন্য গ্রামের মেয়েদের তুলনায় অনেক মাজ্জিত ও সভ্য, এদের কথাবার্ত্তাও ভালো, খানিকটা এ অঞ্চলের বুলি ও টান থাকা সত্ত্বেও ভালো বাংলা বলেই মনে হয়।

নারান হাঁসদা বাঙালী নয় সাঁওতাল। ওদের বাড়িটা একটু বেশি ভালো, আসবাবপত্রও অনেক রকম আছে, কারণ ও গ্রামের প্রধান, অবস্থাও ভালো।

জ্যোতিরিঙ্গণ

নারান হাঁসদার মা এসে বল্লে—ঠাক্‌রাইণরা, আসেন ঘরের মধ্যে। গরীবের ঘরে পা দিচ্চেন, পায়ে জল দিন।

আমি বাইরের ঘরে একটা চৌকির ওপর বসলাম। নারান হাঁসদার ভাই এসে তার ওপর একটা ভালো সতরঞ্চি পেতে দিয়ে গেল।

এতটা পাহাড়ী রাস্তায় এসে শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি গরুর গাড়িতে বেশি উঠি নি, হেঁটেই এসেছিলাম গরুর গাড়ির পাশে পাশে। বালতিতে ঠাণ্ডাজল ঝর্ণা থেকে তুলে নিয়ে এল, হাত মুখ ধুয়ে ফেললাম, মাথাও ধুয়ে ফেললাম। শরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সারাদিনের পরে এখন হঠাৎ হলদে রোদ গাছপালার মাথায়, দূর পাহাড়ের মাথায়। বনকুসুমের সুবাসভরা অপরাহ্ণটি বন্যবিহঙ্গের কলরবে মুখর। ওদের বাড়ির সামনে মস্তবড় কুসুমগাছ, তার তলায় কাঠের আস্ত গুঁড়ি-চেরা ছালটের বেঞ্চি পাতা। সেখানটিতে গিয়ে বসলাম ঝিরঝিরে পাহাড়ী হাওয়ায়। গ্রামটিকে বেষ্টন করে দূরে দূরে নীল পাহাড়মালা। অরণ্যের শ্যামশোভা সারোয়া পাহাড়ের সানুদেশে, দু ফার্লং দূরে পার্ব্বত্য নদীর ধারে ধারে। এ যেন সেই রূপকথার গাঁ যেখানে:

রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকী জ্বলা বনের ছায়ে,
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি
তাহারি মাঝে বাসা।

সহর থেকে অনেকদূরে, পাহাড়ী বনের ধারে শাল আসান মহুল গাছের ছায়ায় লুকোনো আছে রূপকথার গ্রাম। জ্যোৎস্নারাত্রে বনের ফুলের সুবাসে এদের কুটিরের বাতাস মদির করে তোলে, বাঘ-ভালুক উঁকি মারে আনাচে কানাচে, বনের ময়ূর নৃত্য করে এমনি বর্ষার দিনে কুসুমগাছের

ডালে, খুব নিস্তব্ধ শান্তি ও নির্জ্জনতায় ভরা দিনে দিনে এরা গান গাইচে গ্রামের মাঠে পথে। ঝর্ণার স্বচ্ছ জল তুলে আনে সুঠাম বনবধূরা, কুরচি ফুল ফোটা পাষাণপথ বেয়ে রিক্তবৃন্ত করবীর বাঁকা ডালে মাংসল বটের, চাহা, তিত্তির পাখী উড়ে এসে বসে।

সহরের লোকে এ গাঁয়ের সন্ধান খুঁজে পায় না।

নারান হাঁসদার ভাই' এসে বল্লে—বাবু চা দেবো কোথায়? ঘরে আসবেন?

—এখানেই ভালো। বেশ ফাঁকা জায়গা গাছের তলায়।

—পিকা বানাবো বাবু? বিড়ি-সিগারেট এখানে মেলে না।

—চমৎকার হবে—বানাও।

ঘটিতে চা এল আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্ত্তমান কলা আর শসার কুচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই এ গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেচে বাইরে থেকে। অবিশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল।

নারান হাঁসদা বিনীতভাবে বল্লে—আমাদের ইস্কুল দেখবেন? আমার মেয়ে সেখানে মাষ্টার। যাবেন?

নিশ্চয়ই যাবো। আমার জানা ছিল না নারান হাঁসদার কোনো মেয়ে আবার ইস্কুলের মাষ্টার।

বল্লাম—কিন্তু এখনো স্কুল খোলা আছে? বেলা তো বেশি নেই।

আপনি দেখতে যাবেন বলে খোলা রাখা হয়েচে।

সে কি! এতক্ষণ বলতে হয়। চলো চলো—।

অনেকটা গিয়ে গ্রামের প্রান্তসীমায় ফাঁকা মাঠ ও বনের সামনে খড়ের স্কুলঘর। সে এমন একটি স্বপ্নময় সুন্দর জায়গা যে মনে হোল এখানে মাষ্টারি করা একটা সৌভাগ্য। স্কুলের মাঠের অল্পদূরেই নিবিড় অরণ্য-

ভুমির সুরু। রাত্রে নাকি স্কুলের রোয়াকে ভালুক এসে বেড়ায়। জারুল ফুল ফুটে আছে অদূরবর্ত্তী বনশীর্ষে; যে জারুল গাছ কত যত্ন করে কলকাতার রাস্তার ধারে মানুষ করা হচ্ছে।

আমি স্কুলের মধ্যে ঢুকতেই ছাত্রছাত্রীরা উঠে দাঁড়ালো একসঙ্গে। নারান হাঁসদার মেয়ে নার্সদের মত কাপড় পরে নিচু টুলে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিল। বাইশ তেইশ বছর বয়েস হবে, কালো বটে, তবে কুচকুচে কালো নয়, চোখ দুটিতে সরলতা ও ঔৎসুক্যের দৃষ্টি। হাতজোড় করে নমস্কার করলে, আমিও নমস্কার করলাম। বেশ লাগলো মেয়েটিকে।

স্কুলের দেওয়ালে একখানা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো; তার একপাশে মহাত্মা গান্ধীর ছবি একখানা। একখানা বাংলা ক্যালেণ্ডার ঝুলচে তার পাশে, মেজেতে মাদুর পাতা, তাতে ছাত্রছাত্রীরা বসে, সামনে একটা ঘরে নিচু টুল, তাতে বইপত্তর রাখে।

নারান হাঁসদা বল্লে—এই আমার মেয়ে, এর নাম সুশীলা।

আমি বল্লাম—বেশ। আপনি বসুন। আপনার ছাত্রছাত্রীরা কি পড়ে?

মেয়েটি বিনীতভাবে বল্লে—লোয়ার প্রাইমারি পাঠশালা এটা।

একটি ওরই মধ্যে বড় ছেলেকে জিগ্যেস করলাম—কি পড়?

—সরল সাহিত্য পাঠ।

—পড়তো একটু। আচ্ছা বেশ হয়েচে। বোসো। ভাল পড়েচ।

মেয়েটি বল্লে—একটা কবিতা শুনবেন?

—নিশ্চয়ই।

আমাকে অত্যন্ত অবাক করে দিয়ে একটি ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করলেঃ—

ঐ দেখো মা আকাশ ছেয়ে,
মিলিয়ে এল আলো

জ্যোতিরিঙ্গণ

আজকে আমার ছুটো-ছুটি
লাগলো না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন
অনেক হলো বেলা
তোমায় মনে পড়ে গেলো
ফেলে এলাম খেলা।

যে দেশের ঘন বনানী ও পাহাড় অঞ্চলের ক্ষুদ্র সাঁওতাল গ্রামের ছোট ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে. সে দেশ বাংলা ভাষা-ভাষী নয় এ অদ্ভুত মন্তব্য কাদের? তারা এসে যেন দেখে যায়।

বোর্ডে একটা ছোট অঙ্ক দিয়ে ওদের কষতে বল্লে সুশীলা। তারা শ্লেটে অঙ্ক কষে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। গান্ধীজীর ছবি দেখিয়ে ছেলেদের বল্লাম—কার ছবি বলোতো?

বড় বড় ছেলেরা সবাই বল্লে—গান্ধীজীর।

ছোট ছেলে-মেয়েরা উত্তর দিলে না।

আমি ওদের খুব উৎসাহ দিলাম লেখাপড়া বিষয়ে। সুশীলা স্কুলের ছুটি দিয়ে দিলে। আমার স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে নাকি আগামী কালও ছুটি থাকবে।

ছেলেরা তিনবার বল্লে—জয়-হিন্দ! জয়-হিন্দ! জয়-হিন্দ!

একে একে আমায় নমস্কার করে সবাই স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে উচ্চকলরব ও হাসি-খুসির ঢেউ তুলে যে যা'র বাড়ির দিকে চললো।

মেয়েরা দেখি মেয়েদের সঙ্গে খুব জমিয়ে তুলেছে। বেলা গেল, যদিও সুমুখে জ্যোৎস্না রাত, মেঘে ঢাকা আকাশে জ্যোৎস্না বিশেষ সাহায্য

করবে না দুর্গম পাহাড়ী পথে। সেইজন্যে নারান হাঁসদা বার বার বলতে লাগলো—রাত্রে এখানে থাকুন বাবু।

সুশীলা এসে বল্লে—থাকুন রাত্রে আজ। আপনারা থাকলে বড় খুসী হবো।

বল্লাম—আপনি বরং একদিন আমাদের ওখানে আসুন আপনার বাবার সঙ্গে। আজ ছেড়ে দিন আমাদের। সুশীলা চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ থেকে একটা প্রশ্ন ওকে জিগ্যেস করবো ভাবছিলাম। এইবার বল্লাম—

—আপনি কতদূব পড়াশুনো কবেছিলেন?

সুশীলা উত্তর দিল—মেদিনীপুর স্কুল থেকে মাইনব পাশ করেছি। একটা ক্রিশ্চান মিশনে সেলাই আর ইংবিজি শিখেছি কিছুদিন।

—এখানে মাইনে কত পান?

—কুড়ি টাকা।

—স্কুলের লাইব্রেরি আছে?

—সামান্য কিছু বই আছে। রবীন্দ্রনাথের বই কিছু আনাবো এবার।

—কি বই পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের?

—কিছুই পড়িনি। আমি যে মিশনে সেলাই শিখতাম, সেখানকার টিচারের কাছে ওঁর অনেক বই ছিল। ওঁর গানের বই আমার সব চেয়ে ভালো লাগে।

—রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে পারেন?

—গান গাইতে জানি নে! কোনো গানই নয়। শুনতে ভালবাসি। একটা কথা বলবো? ওঁদের মধ্যে যদি কেউ গান কবেন একটি তবে বড় ভাল হয়।

আমাদের বাড়ির একটি মেয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাইলেন। ওরা সবাই খুব মন দিয়ে শুনলে।

এবার আমরা বিদায় নিলাম। আসবার পথে ওরা খানিকদূর আমাদের এগিয়ে দিলে, আর উপঢৌকন দিলে সঙ্গে ঢেঁড়স, কুমড়ো, পাতিনেবু, বড় একছড়া মর্ত্তমান কলা। গোটাচারেক পাকা তাল।

সারোয়া পাহাড়ের ওপরে যখন উঠেচি, তখন অস্তদিগন্তের মেঘের নিচে দূরের পাহাড়গুলো ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একটা চমৎকার ওষধিগন্ধ উঠছে বনলতা গাছপালা থেকে। পাখীদের কাকলী-ধ্বনিতে অধিত্যকার বনানী মুখর হয়ে উঠেচে—একটি পরিচিত পাখীর ডাক শুনে খুশী হলাম। সমতল বাংলাদেশের বাঁশবনে, আমবনে, বৈঁচি ঝোপের পাশে এ পাখী ডাকে—পাপিয়া।

সারোয়া পাহাড় থেকে যখন নামলাম, এপাশে টেঁড়াপানি গ্রামের কুটিরে কুটিরে তখন মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তৈল ও বনকরনজার তৈলের মিটমিটে আলো। কেরোসিন তেল এসব দুর্গম বনাঞ্চলে আদৌ পৌঁছায় না আজকাল, তার ধারও এরা ধারে না।

ডিবুডুংরি পাহাড়ের আগে সেই বনভূমির মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে মশাল জ্বালিয়ে গাড়িখানা চালাতে লাগলো গাড়োয়ান বন্যহস্তীর ভয়ে! অন্ধকার খুব ঘন নয়, মেঘভাঙা জ্যোৎস্নায় পথ দেখতে কোনো অসুবিধে নেই।

হঠাৎ দেখি সেই নির্জ্জন বনপথে দুজন লোক আসচে। দুটিই মেয়েমানুষ।

বল্লাম—বাড়ি কোথায় রে!

—উই গাঁয়ে বটে।

—কোন্ গাঁয়ে?

—টেঁড়াপানি!

—এত রাত্রে কোথা থেকে আসচিস?

—হাটে গিয়েছিলেক আবার কুথা থেকে আসবো বটে।

তা বটে। আজ কালিকাপুরের হাট, মনে ছিল না সে কথা।

এই দুটি মেয়ে যদি এত রাত্রে এই বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অন্ধকার বনপথে নির্ভয়ে আসাযাওয়া করতে পারে, তবে আমরা মস্তবড় দুঃসাহসের কাজ কিছু করছি না রাত্রে গাড়ি করে ফিরে।

আগে ভয় যে না হয়েছিল এমন নয়; এখন লজ্জিত হোলাম সে জন্যে। তবে এ বনই এদের জন্য, কিছু বোঝে না ওরা বন ছাড়া, স্নেহময়ী জননীর অঙ্কের সমান ওদের কাছে এই পাণ্ডববিবর্জ্জিত বনাঞ্চল, বাঘ-ভালুক ওদেব বাল্যসঙ্গী—আমাদের তা নয় এইটুকু বা তফাৎ।

দিবাবসান

যে কটা জিনিষ আমার ভাল লাগছিল তার মধ্যে প্রধান একটা হচ্ছে চারিধারের নির্জ্জনতা—যে দিকে চাই, কোন দিকে কাউকে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয়টী হচ্ছে, গাছপালার সমাবেশে প্রকৃতির কোন দৈন্য চোখে পড়ছিল না—বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, খড়ে, ঘাসে,—অযত্ন সজ্জিত প্রকৃতির পরিস্ফুট বন্য-সৌন্দর্য্য। এই আছে, তার পেছনে আরও, তার পেছনে আরও, দূরে দূরে

আবও নানা বকমের বন-ঝোপেব সমাবেশ, ঠাসাঠাসি, অগাধ সবুজ সমুদ্রে জমাট পাকিয়ে আছে। ইচ্ছামত যত ইচ্ছা দেখতে পাবি, ফুরিয়ে যাবে না, মানুষের হাতে বাছাই ক'রে পোঁতা দু'দশ রকমের সখের গাছ নয়। একটা উঁচু ঢিবির ওপরে নানাজাতীয় গাছ একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে আছে একটা বড় সাঁইবাবলা গাছ, তলায়— আধ-শুকনো উলু-খড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচী গাছ, আসশেওরা, ভাঁট, কচু, ওল, বিছুটি-লতা—সবগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। ঢিবিটার ওপর উঠে নোনা গাছটার ছায়ায় একটু বসলুম। এমন শান্তি অনেক দিন অনুভব করি নি—চারিদিকে চেয়ে শান্তি—কেউ কোন দিকে নেই—আব গাছগুলোর দিকে চেয়ে মহাশান্তি এই যে, সেগুলো মানুষের হাতে পোঁতা নয় আদৌ—সম্পূর্ণ বনজ, একেবারে খাঁটি নিখুঁত বনজ। তলায় একেবাবে শুয়ে পড়লুম, আঃ কি আরাম! হলদে ফুলে ভরা বিছুটিলতা মাথার ওপরে দুলছে, বাতাস লেগে শুকনো সাঁইবাবলাব পাতা ঝর ঝর ক'রে বুকের ওপর ঝরে পড়বে। দুর্গা-টুনটুনি পাখী একেবারে কানের কাছে সেওড়ার ডালে বসে কুচ্‌কুচ্‌ করছে। বড় দুঃখ হল, সঙ্গে কোন বই আনি নি! প্রাণে রস যোগায় এমন বই যদি পড়তে হয় তবে এই তার স্থান, এই রকম শান্ত শীতের অপরাহ্নে এই রকম ধু-ধু মাঠের ধারের নির্জ্জন ঝোপের মধ্যে ডান হাতের খুঁটী দিয়ে মাথাটাকে উঁচু ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে শেলির কবিতা, কি ডারউইন, কি মানুষের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাব ইতিহাস, কি ঐ রকম একটা কিছু। আবদ্ধ লাইব্রেবী ঘরে পুরাতন বই ও ন্যাপথ্যালিনের গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাসের মধ্যে বসে বই পড়লে অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্য্যের আবহাওয়ায়—সন্ত পণ্ডিত হয়ে উঠছি মনে ক'রে পুলকিত হওয়া

যায় বটে কিন্তু এ-রকম নির্জ্জন ঝোপে খোলা আকাশের তলায় বসে পড়বার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আরাম ক'রে পড়বার এই তো জায়গা! গাছগুলোর পাতার দিকে চেয়ে যখন মনে হবে, মাঠের মধ্যের এই সামান্য শেওড়া গাছ, এই সামান্য উলুখড়টাও নয় কোটী মাইল দূরবর্ত্তী সূর্য্যের দিকে পত্র-পুষ্প ফিরিয়ে আছে প্রাণশক্তির ইন্ধন ভিক্ষার আশায়, ঐ বিরাট অগ্নি-পিণ্ডের লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ প্রজ্জ্বলন্ত হাইড্রোজেন-শিখার রক্ত লীলার আড়ালে পৃথিবীর মাঠের এই সামান্য বিছুটিলতাটিরও জীবন লুকানো রয়েছে—ডারউইনের লেখা তখন মনের মধ্যে নতুন রস যোগাবে—শেলীর কবিতার নতুন অর্থ হবে। এ-রকম অবস্থায়—আধ ঘণ্টার মধ্যে মনের হয়তো যে দ্বার খুলে যেতে পাবে, আঁটাসাঁটা বন্ধ ঘরে ইলেট্রিক পাখার তলায় আরাম-কেদারা হেলান দিয়ে পড়লে সাত বৎসরেও সে দ্বারের সন্ধান মিলবে না।

লতা যেমন ঐ বাবলা গাছের আড়ালের হেলে পড়া সূর্য্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে, এখানে মন তেমনি উন্মুক্ত, উদার, বিপুলা প্রকৃতি থেকে নতুন রস পান ক'রে বলী হয়।

বেলা পড়ে যাচ্ছে দেখে নোনা গাছের তলা থেকে উঠলুম্। মাঠের মধ্যে তখন গাছপালার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া পড়ে গেছে—বাবলা বনের ওপর সূর্য্য হেলে পড়েছে। চলতে চলতে আর একটা ঝোপের মাথা থেকে একটা বেগুনে রংয়ের অজানা বনফুল তুলে নিলুম—তার গর্ভকেশরের চারিপাশে ছোট ছোট লাল লাল পিঁপড়েয় ভরা, তাদের সর্ব্বাঙ্গে ফুটন্ত ফুলের পরাগে মাখামাখি,—মধু খেতে এসে তারা গাছের কি মহৎ উপকার ক'রে যাচ্ছে। চেয়ে দেখলুম সে-রকম গাছ চারি পাশে আরও অনেক, সবগুলোতেই ফুল ফুটে

আছে—আমি উদ্ভিদ-বিদ্যার ছাত্র নই, স্ত্রী ফুল পুরুষ-ফুল চিনি নে, তা হলে ব্যাপারটা বেশী ক'রে উপভোগ করতে পারতুম। ঝোপের মাথায় হলদে-পাখা প্রজাপতি উড়ছে—এই সব ছোট ছোট পোকা-মাকড়, প্রজাপতি আর—এই অজ্ঞাত অজ্ঞাত উদ্ভিদ্-জগৎ পরস্পর অদ্ভুত কার্য্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ, পরস্পরেব উপর নির্ভর করছে, গাছপালা কঠিন মাটি থেকে, বায়ু মণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'বে নিজের দেহের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে খাদ্য তৈরী করছে প্রাণী-জগতের জীবন ধারণের জন্যে, ওগুলো তো প্রাণী-জগৎকে খাদ্য জোগাবাব একপ্রকার যন্ত্র। প্রাণী জগৎ কত রকমে তাদের বংশ বৃদ্ধির সাহায্য করছে; আর সকলে মিলে নির্ভব ক'রে আছে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী ঐ বিরাট অগ্নিকুণ্ডটার ওপর। এই পাখী, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটী, ঐ যে উজ্বল হয়ে আসছে ঐ চাঁদটা, এই চারিধার, এই প্রাণী-জগৎ, ঐ লক্ষ্য মাইল দূরের সূর্য্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্তনীয় অসীমতা, সবগুলোর মধ্যে পরস্পর কি আশ্চর্য্য নাড়ীর যোগ? কি বিপুল রহস্যেভরা তাদের এই পরস্পর নির্ভরতা?

মাঠের সামনে গ্রাম পড়ল। অড়হর ক্ষেতের চারিধারে ধঞ্চে গাছের বেড়া দিয়েছে, ওধারে ভুর-ভুর ক'রে কোথা থেকে ফুটন্ত সরষে ফুলের গন্ধ আসছে, এদিকে বেড়ার গায়ে ক্ষুদে-ক্ষুদে ফুল ফুটে বেড়া আলো ক'রে রেখেছে,' গন্ধটায় বড় ঝাঁঝ। মাঝে মাঝে গাছে নাটা ফলের থোলো শুকিয়ে আছে, একঝাড় পাথরকুচি গাছের পরমায়ু ফুবিয়ে আসছে, তাদের পাতাগুলো সিঁদুরের রং হয়ে উঠেছে, একটা ঘন আলকুশি লতার ঝোপের মধ্যে থেকে

শীতের বৈকালের ঠাণ্ডা গন্ধের সঙ্গে কি একটা ফুলের তীব্র ঘন সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে · মাথার ওপর দিয়ে আকাশ বেয়ে এক ঝাঁক বালিহাঁস বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে ..।

কাশির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, গ্রামের ও-দিকের পথ বেয়ে দু'জন র‍্যাপার-গায়ে জুতা-পায়ে ভদ্রলোক আসছেন। এখান থেকে অগ্রসর হওয়াই যুক্তিযুক্ত, এরকম ঝোপের কাছে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তাঁরা আমাকে পাগল ঠাওরাবেন নিশ্চয়, কারণ বিনা কাজে মাঠের মধ্যে ঝোপের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এ-দৃশ্যটা আমাদের দেশে একেবারেই আজগুবি।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই বাড়ী—একজন বৃদ্ধ জন কতক লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে—"এই ত পথ ছিলরে বাপু, মাছ তরকারী সব বাড়ী বসে কেন—বাজারে কি যেতে হতো ? বেগুন সব এমন এমন, আর সস্তাও কি, মনে আছে তখন বিষ্ণুপুরের হাট্ বিষ্ণুপুরেই ছিল রাজগঞ্জে উঠে আসে নি, একবার· " পুরোনো পোড়ো বাড়ীটার একটা দেওয়াল তখনও দাঁড়িয়ে আছে, স্তূপাকৃতি ইটকাঠের মধ্যে নিমগাছ আর যগডুমুর চারা গজিয়ে উঠেছে। দেওয়ালের গায়ে দোতালার সমান উচুতে একটা কুলুঙ্গি—কে জানে, সত্তর বছর আগে হয় তো এই জীর্ণ পরিত্যক্ত আবাসে কোন নববধু তার মেথিতে ভেজান সুগন্ধ নারিকেল তেলের পাথরবাটী ঐ কুলুঙ্গিতে রেখে দিত, ঐ ঘরের মধ্যেই কত বছর আগেকারের তাদের ফুলশয্যার প্রথম প্রণয়ের মধুরাত্রি কেটে গিয়েছে।

কোথায় আজ আশী বৎসর আগেকার সে-সব প্রথম প্রণয়-হর্ষাকুলা তরুণী নববধু ? কোথায় তাদের প্রিয়জনেরা ? কোন্ দূর অতীতে কত দিন হোল ছায়ার মত মিশে গিয়েছে, কে আজ তাদের সন্ধান দিতে পারে ?

একটা বাড়ীর উঠানে একটা বিলাতী আমড়া গাছতলায় একদল পাড়ার ছেলে খেলা ক'রছে, নতুন লোক দেখে তারা খেলা ফেলে আমার দিকে সকৌতুকে চেয়ে রইলো। অন্ধকার ঝুপসি বাঁশ-বাগানের মধ্যে ডোবার ধারে ব'সে একজন পল্লীবধূ বাসন মাজছে—তাদের তরুণ জীবনও সেই বাঁশ-বাগানের মধ্যেকার আসন্ন শীত-সন্ধ্যার মতই ঘুলিঘুলি অন্ধকার। সামনের এক বাড়ীর দোর খুলে আর একটী বধূ এ হাতে একটা ঘড়া ও হাতে আর একটী নিয়ে বার হয়েই হঠাৎ আমায় সাম্‌নে দেখে ঘড়া সুদ্ধ ডান হাতটা তাড়াতাড়ি খানিকটা উঠিয়ে এবং মাথাটা খানিকটা নুইয়ে হাতের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোম্‌টা টেনে দিলেন। একটী বাড়ীর মধ্যে উঁচু মেয়েলি কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—"আমি জানি নে খুড়িমা, মাঝের ঘরেই তো ছিল, কে নিয়েছে আমি জানি নে"! জন চার-পাঁচ ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজন একটা কঞ্চি হাতে উঠানের একটা কুলগাছ থেকে কাঁচা সবুজ কুল পাড়ছে। "ঐ যে রে তোর বাঁ হাতের ডালে আর একটু উঁচুতে—ঐ যে একটু একটু রাঙা হয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ···"বলা বাহুল্য পৌষমাসের প্রথম, রাঙা দূরের কথা কুলের মধ্যে আঁটিও হয় নি। পথের বাঁক ফিরে একটা বেশ বড় বাড়ী—লোহার বড় বড় গজালমারা প্রকাণ্ড সিংদরজা, বালির কাজ খ'সে প'ড়ছে, পাঁচিলের মাথায় বন মুলোর গাছ গজিয়েছে। বাড়ীর সামনে পেরেকে ঝুলানো একটা রং করা ডাকবাক্স, Next Clearnce-এর নীচে Thursday-র প্লেট বসানো।

পাড়া পার হ'য়ে একটা বাঁশ-বাগান প'ড়লো। তার মধ্য দিয়ে রাস্তা, মচ্‌ মচ্‌ ক'রে শুক্‌নো বাঁশপাতার রাশি ও বাঁশের খোলা জুতার নীচে ভেঙে যেতে লাগ্‌লো, পাশে একটা ফাঁকা জায়গায় বুনো গাছপালা-লতা ঝোপের ঘন সমাবেশ, কি বিরাট প্রাচুর্য্য! জীবনের

কি প্রবল উচ্ছ্বাস! সমস্ত ঝোপটার মাথা মুড়ে সাদা সাদা তুলোর মতো রাধালতার ফুল ফুটে র'য়েছে। সমস্ত ঝোপটির কি সম্মিলিত সুগন্ধ, কি স্নিগ্ধ স্পর্শ! এইবার গ্রামের শেষে কাঁওড়াপাড়া। ছোট্ট ছোট্ট চালাঘর, একটার উঠানে শুক্‌না পাতালতা জ্বেলে অনেকগুলো ছেলে-মেয়ে আগুন পোয়াচ্ছে। বাড়ীর পিছনে খেজুর গাছে ভাঁড় ঝুলানো। বাড়ীর মধ্যে সীম গাছ, পুঁই গাছ, লাউ গাছের মাচা, তিন-চারটা কুকুর জুতার শব্দে ছুটে এসে নতুন লোক দেখে বেজায় ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ সুরু ক'রে দিলে। সরু পথ বেয়ে আবার গ্রামের পিছনের মাঠে এসে প'ড়লুম।

মুস্কিল

পিসীমা সকালে উঠে আমায় বল্লেন—যা পয়সা নিয়ে গিয়ে দেখে আয় দিকি বনগাঁর খোঁয়াড়ে। যদি সেখানে গরুটা গিয়ে থাকে,—দেখেই এসো না কেন বাপু—

মা বল্লেন—ওকে পাঠানো আর না পাঠানো দুই সমান। ও কি করবে সেখানে গিয়ে? ও পারবে না। ওর বুদ্ধি সুদ্ধি নেই, কখনো ঘরের বার হয় নি।

এ কথায় আমি চটে গেলাম মনে মনে। বললাম—তুমি পাঠিয়েই ত্যাখো না কেন পারি কি পারিনে। আমি বনগাঁ গিয়ে আর গরু দেখে আসতে পারিনে? খুব পারি।

জ্যোতিরিঙ্গণ

বনগাঁ আমি কখনো যাইনি। শুনেছি সে মস্ত বড় শহর জায়গা। কত গাড়িঘোড়া, লোকজন, রেলগাড়ি আরও কত কি দেখবার জিনিস সেখানে। আমাদের গ্রামের কিছুদূরে যে পাকা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা ধরে পুবদিকে তিনক্রোশ রাস্তা নাকি যেতে হয়।

ওখানে বড় স্কুল আছে। আমাদের গাঁয়ের গিরীন ডাক্তারের ছেলে সুরেন সেখানে স্কুলবোর্ডিংয়ে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে ফিরে এসে বনগাঁ শহরের কত আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প করে শুনেছি। সেখানে যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মা কিছুতেই আমাকে সেখানে যেতে দেবে না। গেলে নাকি আমি গাড়িঘোড়া চাপা পড়বো। গাড়িঘোড়া কি লোকের দিকে তেড়ে ছুটে আসে? সাবধান হয়ে বেড়ালেও কি লোকে গাড়িঘোড়া চাপা পড়ে?

অনেক বুঝিয়ে মাকে রাজি করাই। আট আনা পয়সা দিয়ে মা বললেন—এটা কাপড়ের খুঁটে আলাদা করে বেঁধে নে—তুই আবার যে রকম ছেলে, হারিয়ে ফেলবি কোথায়। আর তুই কিছু কিনে খাস্, এই নে চার পয়সা।

আমি বল্লাম—আরো দুটো পয়সা দাও—

—আবার কি হবে?

—দাও না। খেলনা কি নতুন জিনিস কিনে আনবো।

—যা নিয়ে—

ভাদ্রমাস। চারিদিকে সবুজ আমন ধান ক্ষেতে ক্ষেতে ঢেউ খেলছে। বন-ধুধুঁলের বড় হল্‌দে ফুল ঝোপে ঝোপে ফুটে রয়েছে। শুকনো কাঠ ভেঙে পড়েছে পাকা রাস্তার উপর একটা চট্‌কাগাছের তলায়। একটা বিলিতী শিরিষ গাছে মাকাল-ফল পেকে ঝুলছে। পাট-বোঝাই একখানা গরুরগাড়ি আমার আগে আগে চলেছে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে।

জ্যোতিরিঙ্গণ

আমার মন খাঁচা-খোলা পাখীব মত হয়ে গিয়েছে। কোথায় যেন চলেছি কতদূরে।

বক্স-কুঁচের কাঁটালতায় হলুদ ফুল ফুটেছে, তার কেমন গন্ধ! লতা বেয়ে কাঠবিড়ালি উঠছে ঝোপের মাথায়। দাঁড়িয়ে দেখে দেখে যেমন একটা ঢিল মেরেছি, অমনি পালিয়ে গেল।

পাট বোঝাই গাড়িটা এবার ধরে ফেলেছি। একটা বুড়ো মুসলমান গাড়ি চালাচ্ছে, একটি ছোট ছেলে পাটের বস্তার ওপর বাঁশ ধরে বসে আছে। বুড়োকে দেখতে আমাদের গাঁয়ের ময়জদ্দি কাকার মত।

আমি বল্লাম—কোথাকার গাড়ি?

বুড়ো গাড়োয়ান বল্লে—সানকপুরির।

—কোথায় যাবে?

—বনগাঁয়ে কুণ্ডুদেব আড়তে।

—আমায় নেবে?

—উঠতি যদি পারো ওপরে তবে চলো।

—গাড়ি থামাও।

—থামাতি পারবো না, পেছন দিয়ে ওঠো।

—হ্যাঁ পড়ে মবি আর কি! যাও তুমি চলে।

—ওঠো না খোকা, ভয় কি?

—না তুমি যাও—তোমার আগে বনগাঁ পৌঁছে যাবো।

খানিকক্ষণ জোর পায়ে হাঁটবার পরে কোথায় পড়ে রইল গরুর গাড়িটা! বার বার খুশির সঙ্গে পেছন ফিরে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। একজন বাঙ্গালী মস্ত বড় একটা মাছ নিয়ে চলেছে বনগাঁর দিকে। তাকেও গিয়ে জোর পায়ে ধরে ফেললাম। সে আমার দিকে ফিরে চাইলে। দু' একবার চাইবার পর বললে—বাবা, কোথায় যাবা?

—বনগাঁ।

—কেন?

—গরু পণ্টে গিয়েছে, আনতে যাবো।

—আপনাদের বাড়ি কনে?

—গোপালনগর।

—ওখানে তো পণ্ট আছে।

—সে পণ্টে নাই। আজ দু'দিন হারিয়েছে। মা বললে, বনগাঁর পণ্ট খুঁজে আসতে।

—আজকাল দুষ্টামি করে দূরির পণ্টে দেয়। তো চলো মোর সঙ্গে।

খানিকদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বনজঙ্গলের মধ্যে তালগাছ থেকে ধুপ্ করে একটা তাল পড়লো। আমি ছুটে আনতে যাচ্ছি, মাছওয়ালা বাগ্দী আমাকে বল্লে—কোথায় যাচ্চেন বাবা? যাবেন না। ও জঙ্গলের মধ্যে সাপখোপ আছে, এখন বিকেলে রোদ নেই, দেখতে পাবেন না। আর তাল নিয়ে বইবেন কেমন করে?

সে কথা ঠিক। বইবো কি করে অত বড় তালটা সে কথা ভেবে দেখিনি। তাল পড়বার শব্দ হোলেই দৌড়নো চাই। তখন আরও মনে পড়লো আমাদের পুকুর ধারেই জ্যাঠামশায়দের তালগাছ থেকে আজই সকালে দুটো বড় বড় তাল কুড়িয়ে এনেছি। গিয়ে আরও কত কুড়োবো। কি হবে এখান থেকে তাল বয়ে নিয়ে গিয়ে? রাস্তার দু'ধারে খালি বনজঙ্গল। এক জায়গায় বুনো করমচা পেকে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গী বারণ করলে—খেনো খেওনা। ও তুলো না—

—কেন?

—কেন আবার? বাড়ি থেকে সত্ত বেরিয়েছ ছেলেমানুষ। ও ফল খেলে হাড়ের জ্বর এখুনি টেনে বের করে এনে ফ্যালবে।

—আমাদের বাড়িতে তো কত খায়।

—খায় রেঁধে। কাঁচা কেউ খায় বলতি পারো ?

ওর ওপর আমার বড় রাগ হোল। ও কি আমার অভিভাবক, যা করতে যাচ্ছি তাতেই বাধা দিচ্ছে। তাল কুড়ুতে দেবে না, করমচা খেতে দেবে না, ভালো রে ভালো। তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই। আমি ওকে বল্লাম—বনগাঁ.কতদূর হবে ?

— এইবার চাঁপাবেড়ে ছাড়ালি তবে বনগাঁ।

—তোমার বাড়ি কোথায় ?

—সাতবেড়ে।

দূর থেকে একটা শাদা কোঠাবাড়ি চোখে পড়ছে। ওই হোল বনগাঁ শহর। আমার মন আনন্দে ও ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো। না জানি কত কি জিনিস এখুনি চোখে পড়বে। কত বড় শহর বনগাঁ। কি বড় বড় বাড়ি !

শহরে ঢুকে দু'পাশে দেখতে দেখতে চললাম। মাছওয়ালা বাগ্দী তখনো আমার সঙ্গ ছাড়েনি ; সে বললে চলুন আপনি ছেলেমানুষ, আমি পণ্টঘর আপনাকে দেখিয়ে দিই। আমি যদি তখন তার সদুপদেশ শুনতাম যাকৃগে। আমি তখন ওর ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছি। আমি এসেছি বেড়াতে। বাবার আর মার শাসন থেকে দূরে। আমি এখানে যা খুশি তাই করবো। তুমি কে হে বাপু সব সময়ে আমার পেছনে লেগে আছ ? আমার গরু আমি নিই না নিই সে আমার খুশি। পণ্টে গিয়ে আমি গরু নিলেই আমায় এখুনি গরু নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। আমি একটু বেড়িয়ে দেখতে পারবো না। আমি এসেছি শহর বেড়িয়ে দেখতে।

বাগ্দী সত্যই আমায় ছেড়ে এবার অন্য দিকে চলে গেল : আমি আজ বাড়ি ফিরবো না ; তুমি যাও।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে বাজারে পড়লাম। কি লোকজনের ভিড়! ঝুমঝুমি বাজিয়ে এক জায়গায় কি বিক্রি হচ্ছে। চানাচুর! সে আবার কি জিনিস? একটা লোক ঝুম্‌ঝুমি বাজিয়ে বলছে—চা-না-চুর, মজার চানাচুর গরম! যে খাবে ও পস্তাবে, যে না খাবে ও ভি পস্তাবে—মজার চানাচুর গরম!

কি ও জিনিসটা? খেয়ে দেখবো?

আমি এগিয়ে গিয়ে বল্লাম—কত দাম? কি জিনিস?

—চানাচুর গরম!

—এক পয়সার দেবে?

—কাহে নেহি দেবে বাবা? এই লাও—

লোকটা একটা শালপাতার ছোট ঠোঙা আমার হাতে দিলে। আমি ঠোঙা খুলে ভেতরের জিনিস দেখতে গেলাম তাড়াতাড়ি। ও মা! ছোলা ভাজা আর কি কি ভাজা। কেমন চমৎকার মসলা দেওয়া। একগাল খেয়ে দেখলাম। ও মা, কি চমৎকার! আর এক পয়সার চানাচুর নিলাম, বাড়ি নিয়ে যাবো ছোট ভাইটির জন্যে।

একজায়গায় একটা মুচি জুতো সেলাই করছিল। তার সামনে একটা লোহার তিনপায়া জিনিস, তার ওপর রেখে জুতোয় ঠুক্‌ছিল পেরেক। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। সেখানে কি সব বড় বড় দোকান! কতরকম জিনিস সাজানো। একটা দোকানে নানারকম ফল বিক্রি হচ্ছে, সেইদিকে যেয়ে দেখি, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের গাঁয়ে—কি বিক্রি হচ্ছে বলতো? আম! কেউ কখনো শুনেছে ভাদ্র মাসে আমের কথা? আষাঢ়ের প্রথমে দু'একটা গাছে আম থাকতে দেখা যায় আমাদের ওদিকে। আম এখনো বিক্রি হয়, পাকা আম! আমি সেই ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আমগুলো কতক্ষণ ধরে

দেখলাম। কত শিল-নোড়া একটা দোকানে। এত শিল-নোড়া কেনে কে? কতরকম টোপর বিক্রি হচ্ছে একটা দোকানে। টোপর তো মালিরা করে দেয় দেখেছি। দোকানে বিক্রি হয় জানতাম না। পেছন দিকে একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি—এর নাম কি গাড়ি? বারে! মানুষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার ভেতরে লোক বসে। একজনকে বললাম—ওঁটা কি গাড়ি?

—রিক্সা গাড়ি বলে ওকে খোকা।

—রিক্সা গাড়ি?

—হ্যাঁ! দেখনি কখনো? তোমার বাড়ি কোথায়?

—গোপালনগর। পাড়া গাঁ।

—তাই দেখোনি। এগাড়ি এখানেই নতুন এসেছে। একখানা মাত্র দেখছি।

আরও এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা ফাঁকা জায়গায় ভিড় করে গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম. কি ব্যাপার?

দেখি একটা লোক ফড়্ খেলছে। চার পয়সা দিলে চার আন ফেরৎ দিচ্ছে জিত্লে। আমি ফড়্খেলা আমাদের গাঁয়ে মেলার সময় দেখেছি। বাবা খেলতে দেয় না। নইলে আমার খেলার খুব ইচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, আরও অনেক লোক দেখছে। খেলছেও অনেক লোক। এই উপযুক্ত সুযোগ আর আসবে না। মায়ের দেওয়া আট আনাটা কিছু না ভেবেই একটা ঘরে দিলাম।

খেলার মালিক বললে—কার আধুলি?

—আমার।

—আধুলি উঠিয়ে নাও।

—কেন ? আমি খেলেছি যে !

—না, তুমি আধুলি নিয়ে চলে যাও।

—না, আমি খেললাম যে ! বা রে !

—হেরে গেলে আমার কোন দোষ নেই কিন্তু খোকা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হোল, আমি এবার ঠিক ধরেছি। জিতবো বলে ও শুধু ঐ রকম করছে। চালাকি পেয়েছ ! আমি বললাম—না তোমার কোনো দোষ কেন থাকবে ?

লোকটা অমনি ফড়ের বাটি তুলে বললে—এই চলে এস ছক্কা। তোলো দান—

বাস্ ! আমার আধুলি তিরির ঘরে। চক্ষের নিমেষে লোকটা আধুলিটা আত্মসাৎ করলে।

বললে—গেল খোকা ? তোমায় বললাম ভাল কথা, তোমার আধুলি তুলে নাও—শুনলে না।

আমার চোখে যেন সর্ষের ফুল দেখলাম।

হাতে আর একটা পয়সাও নেই আমার। পণ্টের গরু কি দিয়ে খালাস করে নিয়ে যাবো ? সর্বনাশ ! সেই মাছওয়ালা বাগদী লোকটা সৎপরামর্শই দিয়েছিল, তখন কেন শুনলাম না ? বাবা অবিশ্যি বাড়ি থাকেন না, মা শুনলে কি বলবে ? আ-ট আ-না পয়সা গেল ! এক আধটা কি ? আহা, সেই অপূর্ব বস্তু চানাচুরও যদি কিনতাম ঐ আট আনা দিয়ে, এতগুলো দিতো। বাড়ির সবাই খেয়ে খুশি হোত। এভাবে একেবারে মূলেহাভাত হোত না আধুলিটা।

না, আর কোথাও দাঁড়ালাম না।

মন বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শহর অতি খারাপ জায়গা। পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেতে। চার পয়সা আছে সঙ্গে, ওই পয়সার

পান কিনে নিয়ে যেতে হবে মার জন্যে। মা পান পেলে খুশি হয়। হয়তো আধুলি খোয়ানোর রাগটা একটুখানি কমতে পারে। পান কোন্ দিকে বিক্রি হয়? পান নিয়ে যাই চার পয়সার। বেলা পড়ে আসছে। তিন ক্রোশ রাস্তা এখন যেতে হবে।

গল্প নয়

সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে ঢুকে দেখি কামরাতে আদৌ ভিড় নেই।

সকালের ট্রেণে কামরা অনেকটা খালি পাওয়া যায় বটে। নিজের ইচ্ছামত বিছানা পেতে নিয়ে বসেছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধ মুসলমান একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঢুকলো এবং আমার বিছানার অদূরে বসলো।

খবরের কাগজ পড়বার ফাঁকে খবরের কাগজের ওপর দিয়ে ওদে চেয়ে দেখলাম। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে কখনো পড়েছে কি-না সন্দেহ। বৃদ্ধ মুসলমান পরম যত্নে শিশুটিকে কোলের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছে। কিন্তু শিশুটির চেহারা দেখে মনে হোল, বেশিদিন পৃথিবীর আলো আর বাতাস ওকে ভোগ করতে হবে না। শুধু ক'খানি হাড়ের ওপর চামড়া দিয়ে ঢাকা, মাংস আদৌ নেই বল্লেই হয়, সেইজন্যে হাঁটুর ও পায়ের নীচের চামড়া কুঁচকে জড়ো হয়ে এসেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, মাথার চারিদিকে বড় বড় সাত আটটি ঘা। ওষুধের তুলো লেপ্‌টানো রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা যেমন করে থাকি, তাই করলাম।

কড়া সুরে বল্লাম—সরে বসো না বাপু, একেবারে ঘাড়ের ওপর কেন! গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা তো পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধ মুসলমানটি আমাকে বলতে পারতো অনায়াসেই—কেন মশাই, আপনার বিছানাতে আমি বসিনি তো। তফাতেই বসে আছি, তবে সরে বসতে বলছেন কেন? টিকিট করে আপনিও যা'চ্ছন, আমিও যাচ্ছি। আপনি সরে বসতে বলবার কে?

কিন্তু এক্ষেত্রে যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে। লোকটি সরেই বসলো। আমি আবার আমার খবরের কাগজে মন দিলাম।

একবার গাড়িতে ফেরিওয়ালা উঠে বিস্কুট ফেরি করতে লাগলো। মুসলমানটি শিশুকে 'দু'খানা বিস্কুট কিনে দিলে। আর একবার তাকে চানাচুর কিনে দিলে। আমার মনে হোল, আমার নিজের ছেলে হোলে তাকে এই রুগ্ন অবস্থায় আমি কি বিস্কুট-চানাচুর খাওয়াতাম?

কিন্তু মুখে কোনো কথা ওকে বলিনি।

যা খুশি করুক, আমার বলবার দরকার কি?

এক একবার চেয়ে দেখি, আমার বিছানার কাছে এসে বসলো কি-না। কি কুশ্রী কদাকার হয়েছে দেখতে ছোট ছেলেটা!

ইতিমধ্যে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। গাড়িতেও লোকজনের যথেষ্ট ভিড় হয়ে গিয়েচে।

হঠাৎ আমার কানে গেল একটি ছোট মেয়ের স্নেহময় স্বরে কে যেন বলচে—এ বিস্কুটগুলো তেমন মিষ্টি নয় বলে খোকা খাচ্ছিল না —এখন ভাখো কেমন খাচ্চে। না মা? খাঁখো, কেমন হাত দিয়ে মুখে তুলে কুটুর কুটুর কাটচে।... ..

এমন ধরণের কথা এবং এমন ধরণের সুর আমার কাছে অত্যন্ত

পরিচিত বলেই প্রথম ওই কথাটা আমার অন্যমনস্ক মনকে আকৃষ্ট করে।

আমাদের ছোট্ট খোকাটি যখন তার মামার বাড়ী যায় তখন তার ছোট মাসী ও মামাতো বোনেরা এমনি স্নেহমাখা আগ্রহ নিয়ে খোকার প্রত্যেকটি তুচ্ছ কাজ এবং অকাজ লক্ষ্য করে এবং ঐ রকম সুরে সহর্ষ মন্তব্য করে।

সোজা হয়ে উঠে বসে ভালো করে চেয়ে' দেখলাম, ইতিমধ্যে কখন দু'টি স্ত্রীলোক এসে গাড়িতে ঢুকেছিল আমি লক্ষ্য করিনি। একটি তরুণী বধু, মলিন শাড়ী পরণে, রুক্ষ চুল, মুখশ্রী সুন্দর, চোখ দু'টিতে পল্লী-প্রান্তের শান্ত অবসর। বধুটির পাশে আধা বয়সী একটি থানপরা স্ত্রীলোক, কিন্তু এর রং কিছু ফর্সা, তরুণীটির রং কালো।

দু'জনেই থলে নিয়ে চলেছে এই ট্রেণে চাল আনতে। এরা সম্ভবতঃ উঠেচে বাগনান ষ্টেশনে, যাবে বোধ হয় ঝাড়গ্রামে। প্রত্যেক ষ্টেশনেই দেখেছি চাল আনবার জন্যে পল্লীর গরীব মেয়েরা ভিড় করে উঠছে। কোথা থেকে এরা চাল আনে তা' ঠিক বলতে পারবো না।

এরা দু'টিও সেই দলের লোক। এদের সঙ্গের আট ন' বছরের খাটো কাপড় পরা খুকীটি বোধ হয় আধা-বয়সী স্ত্রীলোকটির মেয়ে।

তরুণী বধুটি জিগ্যেস করচে বৃদ্ধ মুসলমানটিকে—সেখানে আর তারা বুঝি রাখলে না?

এদের আগের কথাবার্ত্তা আমি শুনিনি। কারা রাখলে না, কোথায় রাখলে না, এ সব কথা নিশ্চয় আগে হয়ে গিয়ে থাকবে।

বৃদ্ধ বল্লে—না গো। তাইতে তো একে নিয়ে যাচ্চি।

—মা কতদিন মারা গিয়েচে বল্লে?

—এ তখন সাত মাসের।

সেই মেয়ে দু'টি পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। তরুণীটি বল্লে—আহা!

অন্য মেয়েটি জিগ্যেস করলে—এখন একে কোথায় নিয়ে যাবে?

—বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।

—একে সেখানে দেখবার লোক আছে?

—না গো, কেউ না, আমারেই দেখতে হবে।

—ডাক্তার দেখানো হয় নি?

—কিছু না। পরে কি করে গো?

—বয়েস কত হোল?

—এই এগারো মাস।

—আহা, শরীরে শুধু হাড় আর চামড়া সার হয়েচে।

—তা' নসিবের দোষ। কি করবো। এখন খোদা যদি বাঁচান, তবেই বাঁচবে।

—কি খেতে দিচ্ছ?

কি দেবো, যা জোটে। আমি একা মানুষ বলেই তো' কলকেতায় ওদের ওখানে রেখেছিলাম। এমন হাল করবে তা' কি করে জানবো। করে এখন খবর দিয়েচে, নিয়ে যাও।

—ঠাণ্ডা মোটে লাগিও নি, বিষ্টি হচ্চে, জানলাটা বন্ধ করে দাও। আহা, এমনিতেই তো' ওর কাশি হয়েছে!

আরও কত কি প্রশ্ন মেয়ে দু'টি করতে লাগলো, আমার সব মনে রাখবার কথা নয়। আমাব এটি গল্প নয়; সুতরাং, বানানো কিছু এর মধ্যে স্থান পাবে না। এইটুকু আমার মনে আছে, ওরা দু'জনে যতগুলি প্রশ্ন করলে, সবগুলি ঐ ছোট্ট রুগ্ন খোকার রোগ সম্বন্ধে, পথ্য সম্বন্ধে, ওর চিকিৎসা সম্বন্ধে, ওর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। একবার

তরুণী বধূটি করে আর একবার অন্য মেয়েটি করে, এ একবার, ও আর বার যা কিছু প্রশ্ন, সব ওই খোকাকে ঘিরে। আর ওদের চোখে, বিশেষ করে সেই তরুণী বধূটির চোখে অদ্ভুত স্নেহঝরা দৃষ্টি।

একবার খোকা হাঁচলে।

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—জীব!

আমার অন্যমনস্কতা চলে গিয়েছে ততক্ষণ। আমি বিস্মিত হ'য়ে উঠেছি। এমন একটা ঘটনা যেন দেখছি যা শুধু এই বিংশ শতাব্দীর নয়, সর্ব্বকালের, সর্ব্বযুগের। মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায় স্বার্থপরতায়, ঈর্ষ্যায় যে বিংশ শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূম-মলিন—যে বিংশ শতাব্দীতে আছে শুধু অর্থেব আদর, সেখানে এই ময়লা শাড়ী পরণে দরিদ্রা পল্লীবধূটি ও তাব করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্ত্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্ত্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরণো।

এই গাড়ীর মধ্যে এত পুরুষমানুষ ছিল, কেউ ফিরেও চেয়ে দেখেনি ছেলেটার দিকে। সনাতনী মাতৃরূপা নারী দু'টি এসে এই মাতৃহীন, মৃত্যু-পথযাত্রী শিশুকে মাতৃস্নেহের বহু পুরণো অথচ চির-নূতন বাণী শুনিয়ে দিলে। সেদিন সে ট্রেণের মধ্যে গুটি-কয়েক ক্ষণের জন্য বিংশ-শতাব্দী ছিল না, সমাজদ্রোহী, কালোবাজার-পুষ্ট, লোভী বিংশ শতাব্দী। ছিল সেই অমর মাতৃলোক, বিশ্বের সমগ্র জীবজগৎ যার করুণাধারায় বিধৌত।

পাঁশকুড়া ষ্টেশনে বধূটি ও তার সঙ্গিনী ট্রেণ থেকে নেমে গেল।

—শেষ—

